ছোটদের
বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

ছোটদের বিবেকানন্দ

॥ এক ॥

অনেক দিনের কথা।

সিমলাতে কয়েকটি ছেলে খেলা করছে। এ সেই শৈল-শহর সিমলা নয়। উত্তর কলকাতার একটি পল্লী, হেদুয়া পুকুরের কাছাকাছি।

তখন কলকাতা এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল না। চারিদিক ছিল ঝোপ-ঝাড়ে ভরা।

একটি ছেলে সমবয়সী ছেলেদের বলল—'আয় ভাই, ধ্যান-ধ্যান খেলি।' সকলেই চোখ বুজিয়ে ধ্যান করার ভঙ্গীতে বসে গেল।

এমন সময় এক বিষাক্ত সাপ এসে উপস্থিত। অপর ছেলেরা কপট ধ্যান ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেই ছেলেটি কিন্তু সমানে বসে রইল।

ছেলেদের মুখে একথা শুনে তার অভিভাবকরা এসে পড়লেন। দেখলেন অদ্ভুত ব্যাপার। ছেলেটি একমনে ধ্যানে মগ্ন। তার পাশে ফণা মেলে সেই সাপটি। তাদের কাছে আসতে দেখে সাপটি আস্তে আস্তে চলে গেল।

আর এক দিন।

ছেলেটির বাবা তাঁর বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে দেখেন—ছেলে দেওয়ালে ঝুলানো এক-একটি হুঁকোর কাছে যাচ্ছে আর মুখ দিয়ে টানছে।

তিনি ছিলেন বড় উকীল, তাঁর কাছে অনেক মক্কেল আসত—হিন্দু, মুসলমান, বড় ছোট সবজাতের, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সবরকম।

তখনকার দিনে বিড়ি সিগারেটের রেওয়াজ ছিল না। লোক এলে তামাক খেতে দিতে হ'ত। শুধু বামুন কায়েত নয়, মুসলমান খ্রীষ্টান নয়, যাদের ছোট জাত বলা হত তাদের জন্যও বৈঠকখানায় আলাদা হুঁকো ঝুলানো থাকত।

একদিন ছেলেটি জানতে চাইল—এতগুলো হুঁকো কেন? বাড়ির একজন বুঝিয়ে দিল—এক জাতের হুঁকোতে আর এক জাতের লোক মুখ দেবে কেন? বিশেষ করে নীচু জাতের হুঁকো টানলে জাত যায়।

সব হুঁকোতে মুখ দিতে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন—একি হচ্ছে, বিলে?

আমার জাত যাচ্ছে কিনা দেখছি বাবা—জবাব দিল অতটুকু ছেলে।

বিলে তার আদরের ডাক নাম। ভাল নাম নরেন্দ্রনাথ।

এই যে বালক ছোটবেলায় ঐভাবে ধ্যান-ধ্যান খেলা খেলত, পরে যৌবনকালে পরম ধ্যানী যোগী সন্ন্যাসী

হয়েছিলেন—তাঁকে শুধু তাঁর জন্মস্থান বাংলা দেশ নয়, সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবী স্বামী বিবেকানন্দ বলে আজও পূজার অর্ঘ্য দিয়ে থাকে।

ছোটবেলায় 'জাত যায় কিনা' দেখার খেয়াল হয়েছিল যাঁর, পরবর্তীকালে সারা ভারতবর্ষকে, তাঁর ভারতবাসী সকল ভাইকে জাতের বিচার অসার দেখিয়ে শুনিয়েছিলেন—

"হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাত, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।..."

॥ দুই ॥

সন্ন্যাসী কি একদিনেই হয়েছিল? ছোটবেলা থেকে ঐ দিকেই ছিল তার ঝোঁক।

স্কুলে কোন ছেলে নূতন ভর্তি হতে এলেই তাকে জিজ্ঞেস করত বালক—'তোদের বংশে কেউ সন্ন্যাসী হয়েছে? গিয়েছে কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে?'

'সে খবরে তোর দরকার কি? বাপের অগাধ আয়, আছিস রাজার হালে। তোর সন্ন্যাসীর খোঁজে দরকার কি? তোর বংশে আবার সন্ন্যাসী কি?'—বলত ছেলের দল।

'কিছু জানিস না। আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছলেন। আর সংসারে ফেরেন নি।'

সিমলার দত্তরা বড়লোক, বিখ্যাত। বারমাসে তের পার্বণ। কলকাতার ধনীদের মধ্যে বেশ নামজাদা। সুপ্রীম কোর্টের উকীল রামমোহন দত্তের সময়ে বংশের প্রতিপত্তি খুবই বেড়েছিল।

ছেলে দুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পারশী এবং কাজচলার মত ইংরেজী শিখে বাপের মত আইন ব্যবসায়ে লেগে গেলেন। কিন্তু ধনসম্পদ তাঁকে ঘরে রাখতে পারল না। পঁচিশ বছরেই তিনি সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। বার বছর পরে সন্ন্যাসীদের নিয়ম অনুসারে একবার জন্মস্থান দেখতে আসেন। ছেলে বালক বিশ্বনাথের মাথায় আশীর্বাদ করে চলে যান। তার এক বছর আগেই বিশ্বনাথ মাকে হারিয়েছিল।

এহেন বংশের এহেন বাপের ছেলে হয়েও বিশ্বনাথ দত্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। সংস্কৃত শেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারশী ও ইংরেজী খুব ভাল করে শিখেছিলেন। এ ছাড়া কাজের জন্য তাঁকে এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি স্থানে যেতে হ'ত। সেসব জায়গায় অনেক বড় বড় মুসলমানের বাড়িতে থাকতেন। ফলে তাঁদের আদব-কায়দা অনুকরণ করতেন। সেকালে ইংরেজী-শেখা লোকদের মত খ্রীষ্টানদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারের দিকে টান ছিল।

বনেদী হিন্দুবাড়ির পূজাপার্বণ, আচার-বিচার সব বজায় রেখেছিলেন গৃহের কর্ত্রী ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি নিত্য শিবপূজা করতেন।

বড় দুঃখ। ছেলে হয়নি। সকল সময় ঐ চিন্তা।

একদিন মহাদেবের আরাধনা শেষ, মহাদেবের ধ্যানে বিভোর, তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

হঠাৎ মনে হল দেবতা কোথায়! একটি সুন্দর ছোট শিশু এগিয়ে আসছে কাছে, আরও কাছে, একেবারে এসে গেল তাঁর স্নেহাতুর কোলে।

সুখের ঘুম গেল ভেঙ্গে। জয় শিব, জয় শংকর বলে ভূমিশয্যা থেকে পড়লেন উঠে, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সে কি আলো! সে কি আনন্দ!

॥ তিন ॥

এমন বাবা, এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়! পিতা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, প্রভাবশালী অথচ দানী, স্নেহশীল, আশ্রিত-বৎসল; মাতা মূর্তিমতী নিষ্ঠা ও ভক্তি, করুণা ও শুচিতা।

আজ থেকে ঠিক এক-শ বছর আগেকার কথা। ১২৬৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তি, ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি। ঘরে ঘরে পৌষ-পার্বণের আনন্দ-উৎসব। ভোরে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল।

এই পুণ্য প্রভাতে ভুবনেশ্বরীর কোল আলো করে এল ভুবনবিজয়ী ছেলে। দত্তবাড়িতে সে কি আনন্দ কোলাহল! চার মেয়ের পর একটি ছেলে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরদাদার মত চেহারা ; কেউ বলে নাম রাখো “দুর্গাদাস”। ভুবনেশ্বরীর মনে পড়ল সেই স্বপ্নের কথা : বললেন, নাম হবে “বীরেশ্বর”—যা থেকে ডাকনাম হল ‘বিলে’। আর অন্নপ্রাশনের সময় নাম হল “নরেন্দ্রনাথ”। নরের মধ্যে যে একদিন শ্রেষ্ঠ হবে, সে নরোত্তমের নাম নরেন্দ্র ছাড়া আর কি হবে!

অশান্ত বালক ক্রমশঃ হয়ে উঠল দুর্দান্ত। কিছুতেই ঠাণ্ডা করতে না পারলে মাথায় “শিব শিব” বলে জল ঢেলে দিতেন জননী। আশুতোষ যেমন এতেই সন্তুষ্ট, নরেন্দ্রনাথও একবারে হয়ে যেত শান্ত।

ছোট ভাইয়ের উৎপাতে টিকতে না পেরে বোনেরা প্রহার করতে যেত। চালাক ছেলে নর্দমায় নেমে কাদা মেখে দাঁড়াত। শুচি-অশুচি-বোধ-হীন বালক হাতে তালি দিয়ে বলত, ‘কই আমায় ধর দিকি ?’ সে জানত দিদিরা এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই ছোঁবে না।

মা বলেন—‘দেখ বিলে, এইরকম দুষ্টুমি করলে মহাদেব তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।’

অমনি চুপ। অত চঞ্চল বালক তাকিয়ে থাকে মার দিকে। থেমে যায় সব পাগলামি। হয়ে যায় একেবারে স্থির।

নরেন মাঝে মাঝে বসে ধ্যানে। কে যেন তাকে বলে—চোখ বুজিয়ে বোস ; আসন করে বোস, দেখবি মাথা দিয়ে গজাবে জটা।

কিন্তু কই? জটা ত নামছে না! বুক ফেটে কান্না আসে জটা না দেখে।

মা ভুবনেশ্বরী অবাক্ হয়ে বলেন—একি?

নরেন বলে—আমি শিব হয়েছি।

আবার আকুল হ'য়ে বলে মাকে—কিন্তু জটা ত নামে না! এত ধ্যান করছি, জটা ত গজাল না!

মার বুকে ভয়, ছেলে কি শ্বশুরের মত সংসার ছাড়বে না কি!

বলেন—না, আর জটা হ'য়ে কাজ নেই।

॥ চার ॥

নরেন্দ্রনাথের গুণবতী মার কাছেই তার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। বালক তাঁর কাছেই বাংলা ও ইংরেজী বর্ণমালা শেখে এবং ঐ সময় হতেই রামায়ণ মহাভারত পড়ায় তাঁর প্রবৃত্তি জন্মায়।

রামায়ণ শুনতে শুনতে বালকের হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হয়ে উঠত। একদিন বাজার থেকে শ্রীশ্রীসীতারামের যুগল প্রতিমূর্তি কিনে হাজির।

বাড়ির ছাদের উপর এক নির্জন স্থানে বসে ঐ মূর্তির সামনে বালক ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকে। সীতারামের প্রতি প্রীতি শুনে তার বন্ধু হিন্দুস্থানী কোচম্যান খুব খুশী হল। নরেন রামসীতা

বা অন্য যে-কোনও বিষয়ে যখনই প্রশ্ন করত, সে উত্তর দিতে কখনো বিরক্তি বোধ করত না।

তার বাবার গাড়ির চালকের সঙ্গে কেন তার এত বন্ধুত্ব?

একদিন তার বাবা তাকে প্রশ্ন করলেন—নরেন, তুই বড় হলে কি হবি?

ছেলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান হব।

কোচোয়ানের বুক ফুলিয়ে বসার ভঙ্গী, তেজী ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে টেনে রাখবার কায়দা ও ক্ষমতা, তার আলাদা পোশাক-পরিচ্ছদ, চকচকে চাপরাস, জরীর পাগড়ি বালকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরে কোচোয়ান হওয়ার আশায় বাবার গাড়ির বুড়ো চালকের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিল এবং সুযোগ পেলেই অন্তরালে গিয়ে সহিস ও কোচোয়ানের কাজ দেখা ছিল তার নিত্যকর্ম।

এই কোচোয়ানের কোন কারণে ছিল বিবাহে বিরক্তি। তার মুখে বিবাহের দুঃখের এক করুণ কাহিনী এবং সেই সঙ্গে সীতার করুণ জীবনী শুনে বালক কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল মার কাছে।

আর কি করে সীতারামকে পূজা করা যায়!

মা বললেন—নেই বা সীতারামের পূজা করলে। কাল থেকে শিবের পূজা করো বাবা।

সন্ধ্যার আঁধারে বালক ছাদের উপরে এল। এক হাতে নিল সীতারামের মূর্তি। একদিকে পতিপত্নীর ভালবাসার আদর্শ সীতারাম, আর একদিকে বালক-হৃদয়ে গাঁথা বিবাহে বিতৃষ্ণা। মূর্তিখানি হাত থেকে ছোঁড়া হয়ে পড়ল রাস্তায়। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যথানিয়মে বিলের বিদ্যারম্ভ হয়ে গেল। গুরুমহাশয় তাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়লেন। কড়া ব্যবহারে মারধোরে তাকে বাধ্য করতে পারতেন না। এইসব প্রণালী ছেড়ে বালককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে কাজ আদায় করতে হত।

তারপর বিলেকে ভর্তি করা হল মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশান স্কুলে। সেখানে একদিকে যেমন খুশী হল সমবয়সী সহপাঠীদের সঙ্গ পেয়ে, অন্যদিকে তেমনি অশান্তি বোধ করল তার স্বাধীনতার সংকোচে। শ্রেণীতে সকলে বসে আছে। বিলে উঠল দাঁড়িয়ে, কখনো বা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলে লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু ভাল বাড়ির ছেলের একি অদ্ভুত অশান্ত ব্যবহার! শাসনে কিছু হবে না তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন, মিষ্ট কথায় আশ্চর্য ফল পেতেন।

নরেন্দ্রনাথ তার নিজের গুণে সহপাঠীদের ভালবাসা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অল্পদিনেই পেতে লাগল, খুব শীঘ্রই তাদের নেতা হয়ে দাঁড়াল।

এমনি সময় একদিনের ঘটনা—

দলবল নিয়ে পাড়ার এক চাঁপাফুলের গাছে চড়ে বসল আমাদের বিলে অর্থাৎ নরেন।

গাছের মালিক বাড়ির কর্তা বুড়ো, নরেনের এক সাথী তার নাতি।

কর্তা ত অবাক্, আচ্ছা দুষ্টু ছেলে ত! বলা নেই, কওয়া নেই, গাছে চড়ে বসল!

বুঝলেন, ধমকে কিছু হবে না, ভয় দেখাতে হবে।

'গাছ থেকে নেমে এস।'

'কেন?'

'ও গাছে ব্রহ্মদৈত্য আছে।'

'তাতে কি হবে?'

'দুপুর রাতে ঘাড় মটকে দেবে।'

'তাই নাকি?'

রাত্রির অন্ধকারে আবার এসে হাজির। সাথীরাও সঙ্গে এসেছে বারণ করতে, 'কাজ কি ভাই গাছে চড়ে! কে জানে কি হবে! ব্রহ্মদত্যির কথা আমরাও শুনেছি, যদি সত্যি হয়!'

'লোকে যা বলবে বিশ্বাস করতে হবে? নিজে দেখব না তা

ঠিক কিনা।' লাফিয়ে উঠল গাছের ডালে। বসে বসে দিতে লাগল দোল, ঘাড় ঠিক থাকল।

শিশুকালেই ভাবী বিবেকানন্দের উন্মেষ। চিরাচরিত বলেই মেনে নিতে হবে? কখনই নয়। চাই প্রমাণ, চাই বিশ্বাস।

আর একটু বেশী বয়সে—

গঙ্গার ঘাটে বিলিতী জাহাজ নোঙ্গরে বাঁধা।

দেখতে হবে জাহাজে কি আছে?

যেমন চিন্তা, অমনি কাজ।

সঙ্গীরা বলল—ওখানে যেতে হলে ছাড়পত্র লাগবে, বড় সাহেবের সই চাই।

কিন্তু নরেন ভয় পেয়ে পালাবার ছেলে নয়।

আসা গেছে যখন, দেখতেই হবে।

গটগট করে লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল উপরে।

সামনেই একটি কামরায় বসে আছে এক লাল মুখ।

ঢুকল নরেন পর্দা সরিয়ে।

সাহেব ছোট ছেলের হাতে কাগজ দেখে বিস্মিত।

জাহাজ দেখবার অনুমতি সই হয়ে গেল।

নরেন্দ্র ছোটবেলা থেকেই ভয় কাকে বলে জানত না। বয়স যখন মাত্র ছ'বছর, এক অসীম সাহসের কাজ করেছিল। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে চড়কের মেলা থেকে ফিরছে; হাতে কতকগুলি মাটির মূর্তি মহাদেবের। এমন সময় একটি ছোট ছেলে দলছাড়া হয়ে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় পড়ল—পড়ল

একবারে এক দৌড়ানো ঘোড়ার গাড়ির সামনে। গেল, গেল, রব উঠল। কিন্তু কেউ সাহস করে এগুচ্ছে না। তিলমাত্র দেরি না করে মহাদেবের মূর্তিগুলি বগলে রেখে একরকম ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে এল নরেন্দ্রনাথ। ধন্য ধন্য সাড়া পড়ে গেল।

সব শুনে মার চোখে জল এল, বললেন—সব সময় এইরকম মানুষের মত কাজ করিস, বাবা।

চোদ্দ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথের হল পেটের অসুখ। অস্থিচর্মসার হল ছেলে।

তার বাবা বিশ্বনাথবাবু তখন বিশেষ কাজের জন্য রায়পুরে ছিলেন। বাংলাদেশে নয়, মধ্যপ্রদেশে।

রায়পুরের জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর। নরেন্দ্রকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। সেটা ১৮৭৭ সাল।

তখনো রায়পুর পর্যন্ত রেলের রাস্তা হয়নি, এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হয়ে নাগপুর পর্যন্ত রেলে; তারপর প্রায় পনের দিন গরুর গাড়িতে গেলে তবে রায়পুর।

এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণে, বিশেষতঃ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে রায়পুর যাওয়ার পথে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্তরূপের ভাণ্ডার তাঁর চোখের সামনে প্রথম দেখা দিল। নরেন্দ্রনাথের তরুণ মনে দেশ-মাতৃকার বিচিত্র মূর্তি তাঁর উপর যেন এক ইন্দ্রজাল বিস্তার করল। এই ভ্রমণের প্রভাবের কথা পরে গুরু-ভাইদের সামনে গদগদভাবে বলতে শোনা গেছে নরেন্দ্রনাথকে।

রায়পুরে যাবার সময় নরেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে শিক্ষা-লাভ হয়।

সেখানে তখন স্কুল ছিল না। বিশ্বনাথবাবু নিজেই ছেলেকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্কুলের পড়ার বই ছাড়াও ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে ছেলেকে নানা বিষয় পড়াতে লাগলেন।

আর হ'ত প্রতিদিন বিকেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে সাহিত্য-সভা। বাবার ইঙ্গিতে সে আলোচনায় যোগ দিতেন চোদ্দ বছরের বালক নরেন্দ্রনাথ।

একদিন সাহিত্য আলোচনা করছেন একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বাবার কথায় বাবার সেই বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন সেই বালক।

চমকে উঠলেন সেই সাহিত্যিক। প্রায় সব খ্যাতনামা লেখকের বই পড়েছে এই বালক।

বিস্ময়ে ও আনন্দে বলে উঠলেন—বাবা, তুমি নিশ্চিত একদিন বাংলা ভাষার গৌরব বাড়িয়ে তুলবে।

এই ভবিষ্যৎ-বাণী কি সফল হয় নি? হয়েছে বই কি! 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' কে লিখেছিলেন?

স্বামী বিবেকানন্দ।

এভাবে কাটল দু'বছর। এ দু'বছর বাবার কাছে শুধু কি বহু জ্ঞানলাভ করেছিল নরেন্দ্রনাথ। তাঁর মহৎ স্বভাবের

ছাপও ভালভাবেই পড়েছিল এই কিশোরের হৃদয়ে। তেজস্বিতা, পরদুঃখকাতরতা, বিপদে ধৈর্য, সুখে-দুঃখে সমানভাবে কাজ করে যাওয়া—নরেন এসব শিখেছিল মহৎপ্রাণ বিশ্বনাথবাবুর কাছেই।

কিন্তু শুধু পিতার কাছে নয়।

নরেন্দ্রনাথের চরিত্রে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ তার বেশীর ভাগই সে পেয়েছিল তার জননী ভুবনেশ্বরীর কাছে।

তিনি ছিলেন সিংহিনী, তাই তাঁর গর্ভে এসেছিল নরেন্দ্রনাথের মত পুরুষসিংহ।

বাইরে ছিল তাঁর নারীসুলভ কোমলতা, কিন্তু তার অন্তরালে ছিল অসামান্য দৃঢ়তা, যা সদাই অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াত।

এমন না হলে ভাগীরথীতীরে, পুত্র স্বামী বিবেকানন্দের চিতার পাশে দাঁড়িয়ে অকম্পিতস্বরে শেষ প্রার্থনায় যোগ দিতে পারতেন কি? ভুবনবিজয়ী পুত্রের দেহত্যাগের পর ১৯১১ সাল পর্যন্ত ন'বছর বেঁচে ছিলেন এই মহীয়সী মহিলা।

॥ ছয় ॥

দীর্ঘ দু'বছর পরে কলকাতায় ফিরে এল বন্ধুদের মাঝে নরেন্দ্রনাথ; সকলের কি আনন্দ!

অনেক বদলে গেছে তার দেহ মন দুই-ই!

দু'বছর অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্তি হতে বেগ পেতে হল। শিক্ষকরা তাকে ভালবাসতেন। তার জন্য বিশেষ অনুমতি নেওয়া হল।

দু বছরের পড়া শেষ করল এক বছরে, প্রশংসার সঙ্গে পাস করল প্রথম বিভাগে। সেটা হল ১৮৭৯ সাল। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সে-বছর পাস করে প্রথম বিভাগে।

এই স্কুলে পড়ার সময় নরেন্দ্রনাথের প্রতিভা নানারকমে প্রকাশ পেয়েছিল।

একবার এক পুরাতন নামকরা শিক্ষক অবসর নেবেন, তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন দিতে হবে। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার দেওয়া হবে, সেই সভায় ঐ অভিনন্দন দেওয়া হবে ছেলেরা ঠিক করল। ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন দেশবিখ্যাত বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর সামনে বক্তৃতা করার সাহস আর কোনো ছাত্রের হল না। নরেন্দ্রনাথকেই সভামঞ্চে দাঁড়াতে হল। আধ ঘণ্টা সুন্দর ইংরেজিতে বক্তৃতা, বিদায়ী শিক্ষকমহাশয়ের গুণাবলীর বর্ণনা। সুরেন্দ্রনাথ এত মুগ্ধ হলেন যে নিজের বক্তৃতার সময় নরেন্দ্রর অজস্র সুখ্যাতি করলেন।

ষোল বছরের ছেলের কি সাহস, কি দৃঢ়তা, কি ক্ষমতা, কি আত্মবিশ্বাস!

কলেজে ভর্তি হলেন আঠার বছর বয়সে। প্রথম গেলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগে সে-বছরের পড়া নষ্ট হল। পরের বছর আবার ভর্তি হলেন জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌স্টিটিউশনে।

এফ্‌. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ মিল, হিউম, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির ন্যায় ও দর্শন বিষয়ের বই পড়তে শুরু করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেষ্টি সাহেব একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একদিন কলেজের আলোচনা-সভায় বলেছিলেন—জার্মানির বা ইংলণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন প্রতিভাশালী ছাত্র আমি দেখি নি।

লেখাপড়ার সঙ্গে শরীরচর্চার দিকেও নরেন্দ্রনাথের বিশেষ ঝোঁক ছিল। ডন বৈঠক করা, কুস্তি অভ্যাস করা, ক্রিকেট খেলা প্রভৃতিতে তিনি নিয়মিত নিযুক্ত থাকতেন।

পড়ার মাঝে মস্তিষ্ককে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে রহস্য-পরিহাসে যোগ দিতেন। অন্যের তুলনায় তাঁর পড়া অনেক অল্প সময়ে হয়ে যেত। এতে ঐরূপ হাস্য-পরিহাস এবং গানের জন্য অনেক অবসর পেতেন। যাঁরা তাঁকে ঠিক বুঝতে পারতেন না, তাঁরা হয়ত এসবের সমালোচনা করতেন। কিন্তু তেজস্বী, স্বাধীনচেতা নরেন্দ্রনাথ এসব গ্রাহ্যই করতেন না।

নরেন্দ্রনাথ এ সময়ে বাড়ির নিকট তাঁর দিদিমার ভাড়াটে বাড়ির একটি কামরায় থাকতেন। বাড়ির লোকে মনে করত,

বাড়িতে গোলমালে পড়াশুনা ভাল হয় না বলে নরেন্দ্র বাড়িতে থাকেন না।

কিন্তু আসল কথা, এ বয়স থেকেই তিনি সাধন-ভজন শুরু করেছিলেন। প্রকৃত জ্ঞান লাভের ইচ্ছা, সত্য জানবার পিপাসা ক্রমশঃ তাঁকে আকুল করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন নরেন্দ্রনাথকে ধ্যান করবার উপদেশ দিলেন। বললেন—তোমার দেহে যোগীর লক্ষণ দেখছি; তুমি ধ্যান করলেই শান্তি ও সত্য লাভ করবে।

মহর্ষির কথায় তাঁর ধর্মানুরাগ দ্বিগুণ হয়ে গেল। তিনি রীতিমত ব্রহ্মচর্য পালন করতে লাগলেন। মাটিতে শোয়া, পরিমিত নিরামিষ খাওয়া এবং সাদা থান ধুতি চাদর পরা প্রভৃতি কঠোর সাধন শুরু করলেন। দিদিমার বাড়িতে নির্জনে এ সকলের খুব সুবিধা হত।

সাধন-ভজনের সঙ্গে পড়াশুনা, সংগীতচর্চা আদিও ঠিকমত চলতে থাকল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সংযোগ হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজে। সত্যের সন্ধানের প্রেরণাই তাঁকে ব্রাহ্মসমাজে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যও হয়েছিলেন। কিন্তু উপাসনা আদি বিষয়ে তিনি অন্য সভ্যদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। সুতরাং এখানেও তাঁর অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় নি।

এমন সময় এল এক শুভদিন।

নরেন্দ্রনাথদের পাড়ায় সুরেন্দ্র মিত্র মহাশয় দক্ষিণেশ্বর হতে শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেখানে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। অন্য গানের লোক না পাওয়ায় সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথ সেখানে গান করেন। ঠাকুর সে গান শুনে খুব খুশী হন এবং নরেন্দ্রনাথের পরিচয় সব জেনে নেন; এবং নরেন্দ্রনাথকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে অনুরোধ করলেন।

ঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম পরিচয়। নভেম্বর মাস, ১৮৮০ সাল।

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। কারণ এফ্. এ. পরীক্ষার জন্য তখন তিনি বিশেষ ব্যস্ত।

সেই সময় এল আর এক কঠিন পরীক্ষা। তাঁর বাবা মা তাঁর বিয়ের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। এ বিয়ে হলে মেয়ের ধনী পিতা দশ হাজার টাকা যৌতুক দেবেন।

বাল্যকাল হতে বিবাহবিমুখ নরেন্দ্রনাথ ঘোর আপত্তি করলেন। বিশ্বনাথবাবু কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করতেন না। তবু দু-একজন আত্মীয়-বন্ধুকে এ কাজে লাগালেন। তার মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত; তিনি বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলেন এবং আত্মীয়ও ছিলেন বটে।

বিবাহে মত করাতে পারলেন না। তবে ডাক্তার দত্ত নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের অশান্তির কথা ভালভাবেই জানতে

পারলেন। তখন তিনি বললেন—'যদি সত্য-সন্ধানই তোমার কাম্য হয়, ব্রাহ্মসমাজ আদিতে না গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চল।'

॥ সাত ॥

কয়দিন পরের কথা।

দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথকে দেখা মাত্র তার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এমনভাবে আলাপ করতে লাগলেন যেন তিনি কতদিনের পরিচিত।

তার পর হল কত গান। গাইলেন নরেন—

'মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।'

'আর একখানা গা'—বললেন ঠাকুর।

নরেন্দ্রনাথ আবার গান ধরলেন—

'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে—
আজি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

ভাব লেগেছে ঠাকুরের মনে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ধরলেন নরেনের হাত, নিয়ে এলেন একরকম টেনে উত্তরের বারান্দায়।

বন্ধ হল বাইরের দরজা। মুখোমুখি বসলেন দুজনে।

ঠাকুরের চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কেঁদে কেঁদে বলছেন—

'কোথায় ছিলি এতদিন? তোর কি দয়া মায়া নেই? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চেয়ে আছি তোর পথ পানে। কি করে আমায় ভুলে ছিলি?'

আবার বললেন—'সেদিন মাঝরাতে তুই এলি আমার ঘরে; আমায় ঘুম থেকে তুললি। বললি—আমি এলাম।'

চমকে উঠলেন নরেন—'আমি ত কিছু জানি না। আমি তখন আমার কলকাতার ঘরে দিব্যি ঘুমোচ্ছি। কি বলছেন আপনি!'

জোড়হাতে বলেন ঠাকুর—'তুমি জান বই কি? আমি বেশ জানি, তুমি সপ্তর্ষির এক ঋষি। এবার এসেছ, জীবের দুঃখ, দৈন্য, কান্না, হাহাকার দূর করতে।'

কি বলে এই পাগল! লোকে ঠিক বলে বটে, দক্ষিণেশ্বরে আছে এক পাগলা বামুন, আবোল-তাবোল বলে!

মনে হল শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। যেতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু উঠি উঠি করেও ত উঠতে পারছেন না!

ঠাকুর ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এলেন—মাখন, মিছরি, সন্দেশ; বললেন—'হাঁ কর, খা।'

বাইরে বন্ধুরা বসে। একলা খেতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু কে শোনে আপত্তি! মুখে খাবার পুরে দিতে লাগলেন ঠাকুর। বললেন—'তুই খেলেই সবার খাওয়া হবে। আবার

আসবি ত? দেরি করিস নে। একলা একলা আসবি'—আকুল অনুরোধ ঠাকুরের।

প্রণাম করে বিদায় নিলেন নরেন্দ্রনাথ।

•

বিষম সংশয়ে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে পাগল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এঁর মধ্যে কি গভীর রহস্য আছে তাই ভাবতে ভাবতে ফিরে এলেন বাড়িতে।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত চলল। প্রায় তিন বছর পরীক্ষা চলল। তারপর ঠাকুরের চরণপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন নরেন্দ্রনাথ। সে অনেক পরের কথা।

॥ আট ॥

এফ্. এ. পাসের পর বি এ. পড়ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে বিখ্যাত এটর্নী নিমাইচরণ বসুর কাছে আইন শেখাও চলছিল।

পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়া তেমন করতে পারেন নি।

একে-তাকে বলে ফল না হওয়ায় একদিন ব্রাহ্মসমাজ ঘরে এসে উপস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ। উপাসনা চলছে, আচার্য উপদেশ দিচ্ছেন। সব গোলমাল হ'য়ে গেল। ঠাকুরের উপর ব্রাহ্ম-

সমাজের কর্তাদের ভাল ভাব ছিল না। কেশব, বিজয়ের মত ব্রাহ্মকেও জাদু করে ফেলেছে ঐ পাগলা বামুন।

উপাসনা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের আলো পর্যন্ত নিবিয়ে দেওয়া হ'ল।

নরেন্দ্রনাথ শাসনের সুরে বললেন—'কেন এলেন আপনি এখানে?'

'আমি এসেছি তোকে একবার দেখতে। তুই আজ এখানে থাক্‌বি ভেবে ছুটে এসেছি।'

'আপনাকে কি রকম অপমান করল দেখলেন ত? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যায়।'

'আমার অপমানে ওর বুক ফেটে যায়!' আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন ঠাকুর।

'আমায় ভালবাসেন বলে কি কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না! এত ভালবাসলে শেষে ভরত রাজার মত অবস্থা না হয়!' আবার বললেন নরেন্দ্রনাথ।

আর এক দিনের ঘটনা, যার ফলে নরেন্দ্রনাথ নিজেকে বিকিয়ে দিলেন ঠাকুরের পায়।

অশান্ত তাঁর মন, ব্যাকুল তাঁর হৃদয় ঈশ্বরলাভের জন্য। কোথাও তাঁর প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান মিলল না।

দর্শনের কত বই পড়লেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কেউই তাঁর জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারলেন না।

প্রশ্নটি হল, 'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?'

উত্তর দিলেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ—'হাঁ দেখেছি। শুধু দেখেছি নয়, তোকেও দেখাতে পারি।'

ঈশ্বর-দর্শনের অনুভূতি মিলে গেল। চির অশান্ত মন পেল এক বিমল শান্তি।

॥ নয় ॥

শেষ হয়ে গেছে বি. এ. পরীক্ষা।

বরানগরে বন্ধু ভবনাথ চাটুজ্জের বাড়ি নেমন্তন্ন। সাতকড়ি লাহিড়ী আর দাশরথি সান্যালও জুটেছেন। খুব আনন্দ। আড্ডা জমজমাট।

রাত দুটো। সারা দিনরাতের ক্লান্তির পর শুয়েছেন চার বন্ধু।

হঠাৎ খবর গেল, শেষ ঘুমে ঘুমিয়েছেন বিশ্বনাথ দত্ত হার্টফেল করে!

বাবা আর নেই! মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সব সুখ সব আনন্দ। বিপদের আঘাতে হল নীরব, স্তব্ধ সেই চিরস্ফূর্তিময় যুবক।

আকস্মিক এই দারুণ আঘাত, চোখে এল না জল।

ভাবলেন নরেন্দ্রনাথ, আর বসে থাকলে চলবে না। বেরিয়ে পড়লেন।

'আমিও যাচ্ছি'—বলে সঙ্গে চলল ভবনাথ। বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াল সেই অকৃত্রিম বন্ধু তাঁর সুখ-দুঃখের সাথী—যাকে পরে একদিন বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'জন্ম-জন্মান্তে বোধ হয় তুই ছিলি নরেনের জীবনসঙ্গিনী।'

সিমলায় এসে কি দেখলেন নরেন। মা ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছেন, কাঁদছে ভাইবোনেরা বাবার মৃতদেহটির চারদিকে।

শেষ কাজ শেষ হল। তারপর! দানী এটর্নী বিশ্বনাথ দত্ত কিছুই রেখে যাননি। অধিকন্তু নরেনের ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন কিছু ঋণ।

অভাগিনী জননী; ছোট ছোট ভাইবোন। পাঁচ-সাতটির মুখে দিতে হবে অন্ন। কিন্তু নরেন একেবারে সম্বলহীন।

কেউ ত এসে দাঁড়াল না। যারা বিশ্বনাথ দত্তের খেয়ে মানুষ, তারা সকলেই পড়ল সরে। ভুলে গেল সব উপকার।

চলেছেন নরেন্দ্রনাথ একা, খালি পা, ছেঁড়া কাপড়। সহায় নেই কেউ।

কে যেন বলে উঠল—'সত্যি কি আর কেউ নেই তোমার?'

কে বলল? কেউ কোথাও নেই, 'একি প্রভুর সান্ত্বনা! পরম কৃপাময় ঈশ্বর! তুমি যদি আছ তবে এত কষ্ট, এত অপমান কেন?'

যেখানেই যায় চাকরির চেষ্টায়, 'কাজ খালি নেই' এই এক জবাব। শুধু প্রত্যাখ্যান আর প্রত্যাখ্যান।

হঠাৎ তাঁর ভেতরের তেজ জ্বলে উঠল। 'না, আর ভিক্ষা নয়; চাই না কারো করুণা।'

এমন সময় ডাক এল—'বাবু, আস্থন'। চমকে উঠে দেখেন নরেন্দ্র তাদের সেই পুরানো কোচোয়ান গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, তার পুরানো সঙ্গী, বন্ধু।

'তোমার গাড়ি চড়লে পয়সা দিতে পারব না ত।'

'তাতে কি হয়েছে, আস্থন।'

'না, না, তা হয় না। তুমি যাও ভাই।'

॥ দশ ॥

এই দুঃখের কষ্টের দিন আর শেষ হয় না।

এমন কতদিন গিয়েছে যে বাড়িতে অন্নের জোগাড় নেই, বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন বলে মাকে ভুলিয়ে বেরিয়ে গেছেন নরেন্দ্রনাথ। আর খালিপেটে, খালিপায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

এমন সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন কলকাতার মুখুজ্জেদের বাড়িতে।

ডাক পড়ল নরেনের। ঠাকুর ডেকেছেন।

নরেন একবার ভাবে, কি হবে গিয়ে ঠাকুরের কাছে—পারবেন কি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দুঃখ দূর করতে!

তবু গেলেন তিনি ঠাকুরের কাছে। শুক্‌নো মুখ, ধুলোয় ব্যথায় মলিন।

ঠাকুর বললেন—“ঈশানকে তোর কথা বলেছি। কাজ একটা জোগাড় হয়ে যাবে হয়তো।”

ঠাকুর চলে গেলেন অন্য ঘরে কিন্তু কে যেন বললেন—‘তুমি আগে এত গান গাইতে, এখন আর গাওনা কেন?’

গাইলেন নরেন্দ্রনাথ। দুঃখের গান, শান্তির গান ঃ

দুঃখ আমার হোক চির সাথী—
আসুক আঁধার দুঃখভরা রাতি,
হাসি মুখে নেব তোমার দানের হার—
দুঃখ যামিনীর বুকে হোক মোর জীবনের সঞ্চার।

ফিরে এলেন নরেন্দ্রনাথ।

একদিন সকালে উঠেই নাম নিচ্ছেন ভগবানের। মা বললেন—‘ছোট বেলা থেকে ত ভগবান্ ভগবান্ করলি, ভগবান্ ত সব করলেন।’

সত্যি ত! বিঁধল কথাটা নরেনকে।

ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে। সোজা গিয়ে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে—‘ঈশ্বর কিসে দয়াময় বলুন ত? তা হলে কি এত কষ্ট ভুগতে হয়?’

হেসে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—‘সে কি কথা গো! রাত্রির শেষ যামে দেখা যায় আলো। আঁধার রাতের অবসানে অরুণোদয়। সুখ ত দুঃখের সঙ্গে চলে। আগে দুঃখ জয় কর, সুখ আসবে আপনি। ঈশ্বর নেই কি রে?’

'তাঁর কাছে যেতে হলে ঝাঁপ দিতে হবে সাগরে, পার হতে হবে দুঃখের রাত্রি। দুঃখের আগুনে করতে হবে আত্মশুদ্ধি।'

মন দোল খাচ্ছে। এমন সময় একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, ভুবনেশ্বরী পূজার ঘর থেকে বেরুচ্ছেন, হাতে তাম্রপাত্র। লজ্জা পেলেন মনে করে সেদিন যা বলেছিলেন নরেনকে ভগবান্ সম্বন্ধে।

'আমাকে একখানা পাট-কাপড় দিতে পারিস বাবা? আর ত এটা পরা যায় না।' বললেন জননী।

কিন্তু কোথা হতে দেবেন! কি আছে তাঁর? মোটা ভাত মোটা কাপড় জোটাতে পারেন না, চেলির কাপড় কোথা থেকে আনবেন?

অনেক চেষ্টা করলেন। একখানি পাট-কাপড় মাকে দিতে পারলেন না।

মন গেল ভেঙ্গে, ভাল লাগলো না আর সংসার। ছুটলেন দক্ষিণেশ্বরে।

'তুই এসেছিস্, ভাল হয়েছে। নে এই মিছরির থালা ও গরদখানা'—স্নেহমাখা স্বরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

'গরদ কি হবে?'

'তোর মার চেলি ছিঁড়ে গেছে। নে—গরদ পরে আহ্নিক করবে।'

অবাক হলেন নরেন্দ্রনাথ। কি করে পেলেন ঠাকুর এ খবর! তিনি কি অন্তর্যামী?

'তোকে ত দিচ্ছি না, তোর মার জন্য দিচ্ছি।'

'মার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষা নেব কেন?'

একটু হাসলেন রামকৃষ্ণ।

কিছুতেই নেবেন না নরেন্দ্রনাথ!

'ওরে সাধে কি তুই নরেন্দ্র? আমরা হলাম নর। আর তুই যে নরের ইন্দ্র। তাই নরের দেওয়া ভিক্ষে নিবি না বুঝি?'

প্রত্যাখ্যান করে চলে এলেন নরেন্দ্রনাথ, চলে এলেন বাড়িতে।

ভক্ত রামলালকে ডেকে বললেন ঠাকুর—'যেতে হবে নরেনের বাড়ি।'

'কেন?'

'নরেন বাড়িতে না থাকে এমন সময় চুপিচুপি তার মাকে এই গরদখানা ও মিছরির থালা দিয়ে আসতে হবে।'

সুযোগ মিলে গেল। ঘরে গিয়ে ঢুকল রামলাল।

'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনার জন্য এই গরদখানা আর মিছরির থালা।'

হাত পেতে নিল ভুবনেশ্বরী দয়াল ঠাকুরের দয়ার দান। আবেগে বলে উঠলেন—'তুমি কি অন্তর্যামী! তা না হলে বিলের সাথে এখানে কি কথা হল তা টেলিগ্রাম হয়ে গেল দক্ষিণেশ্বরে!'

নরেন্দ্রনাথ এসে দেখলেন, মা পরে বসে আছেন সেই পাটের কাপড়।

সব গুলিয়ে গেল নরেনের মাথায়।

'কে তুমি প্রভু! আর রেখো না দূরে। নেমে এস আমার হৃদয়-মন্দিরে। পারি না বইতে এই সংশয়-দোলা।'

॥ এগার ॥

বুধবার আবার যাবে বলে এসেছিলেন। কত বুধবার গেল, নরেন্দ্রেনাথ ত আর যায় না।

ঘোর অভিমান। এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত অভাব। এত অশান্তি; তবু কি একবার আসবার অবসর হয় না তার দিকে।

এল একদিন রামলাল। বলল—'ওহে, বুধবার যাবে বলে এলে ঠাকুরকে; বুধবার কি হয়নি?'

'যাব বলে মনে করি, কিন্তু সংসারের ঝঞ্ঝাটে সব গুলিয়ে যায়, যাওয়া হয়ে ওঠে না।'

'আজ যেতেই হবে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

চললেন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুরের চোখ পড়ল নরেনের টেরি-কাটা মাথার দিকে।

'এমনি টেরি-কাটা কেন গো! তোর আবার এসব কেন?' এলোমেলো করে দিলেন মাথার চুল। গোছাল জীবনধারায় এনে দিলেন অগোছাল ভাব। দেহের দিকের নজরটাকে ঘুরিয়ে দিলেন মনের দিকে।

'আজ থাকবি ত এখানে?'

'থাকব।'

শুনে ঠাকুর যেন আনন্দে আত্মহারা। ভাল খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল রাতের জন্যে।

অন্নদা গুহকে ডেকে বললেন—'তুই ত নরেনের বন্ধু। ওদের এত কষ্ট। দিন চলে না। তোরা না দেখলে এ সময় কে দেখবে ?'

অভিমানে লজ্জায় বলতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ—'কেন ওকে এমন করে বললেন ? আমার দুঃখ আমার আছে। কারো কাছে ভিখ মাগতে যাব কেন ? আমি কি ভিখারী ?'

'তুই কেন হবি ভিখারী ? আমি দুয়ারে দুয়ারে তোর জন্য ভিখ মাগব।'

দুঃখে গলে গেলেন ঠাকুর নরেনের কষ্ট দেখে। নরেন করছে অভিমান তাঁর উপর। এবার তিনি অভিমান করলেন তাঁর 'ভবতারিণী' মার উপর।

'পাষাণি! দেখতে পাস না নরেনের দুঃখ-কষ্ট ? নরেনকে বাঁচা। তার পথ সহজ করে দে মা!'

রাত গভীর হয়ে এল। নিস্তব্ধ সারা বাড়ি।

নিয়ে গেলেন নরেনকে নির্জনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন। আর কেউ নেই।

কত কথা বলতে লাগলেন ঠাকুর। কত ভাব দেখলেন তাঁর নরেন্দ্রনাথ। তাকে বলছেন যত মনের কথা—

'যত দিন আমি আছি, তুই থাক সংসারে, আগে বুঝে নে সংসারটা। তারপর ত বিরাগী হবি। ধৈর্য না ধরলে চলবে কেনে গো ? যে তোকে পাঠালে তার গুণগান করবি না ? আমরা এসেছি কেবল তার দেওয়া কাজ করার জন্যে। সারা

জগৎকে শোনাতে হবে ভারতের সাধনার চিরন্তন বাণী। সেই হবে তোর কাজ।'

ভোর হয়ে এল। ফরসা হল। এল দিনের নূতন আলো।

নরেনের মনেও জাগল এক অপূর্ব আলো, এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ। চলে গেল সব সংশয়, সব বিষাদ।

বাড়িতে ফিরে এল নরেন। সে কি আনন্দ! নিয়ে এল দীক্ষা। বেশ বুঝে এল, শ্রীরামকৃষ্ণ বই আর কেউ নেই—অপার আনন্দ, অসীম শান্তি দিতে।

নরেনের জীবনে শুরু হল নূতন অধ্যায়।

॥ বার ॥

সংসারে আর মন নেই। কিন্তু কর্মের শেষ না হলে ত কাজ ছাড়বে না।

নাবালক আর বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য নরেনের জ্ঞাতিরা লেগে গেল।

নরেন অন্যায় সইবার ছেলে নয়। সেও বেঁকে দাঁড়াল।

জ্ঞাতিরা মামলা করেছিল বাড়ি ভাগ করে নেওয়ার জন্য। যাতে বাড়ির ভাল অংশটা পায় এই ছিল লক্ষ্য।

পিতৃবন্ধু বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নরেনের পক্ষে মামলা চালাবার ভার নিলেন।

মামলা চালানর সময় চরিত্রের দৃঢ়তা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি কতগুলি গুণ প্রকাশ পায়। বিপক্ষের উকীলের জেরার উত্তরে নরেনের নির্ভীক স্পষ্ট উত্তর শুনে জজসাহেব বলেছিলেন—'যুবক! তুমি আইন পড়েছ; কালে ভাল উকীল হবে।'

নরেনের পক্ষেই রায় দিলেন জজ।

মাকে আনন্দের খবর দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বিপক্ষের উকীল হাত ধরে বললেন—'জজসাহেবের সঙ্গে আমিও একমত। আইনের ব্যবসায়ে আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।'

বাড়িটা বেঁচে গেল কিন্তু সংসার চলে না।

চলল ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর তার জন্য কি না করতে পারেন!

কিন্তু ঠাকুরও পরীক্ষা না করে ছাড়বেন না।

'মায়ের দয়া ছাড়া কিছুই হবে না। কিন্তু তুই ত মাকে মানিস না।'

সত্যই ত নরেন নিরাকারবাদী, মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। ঠাকুরের কথা শুনে মাথা নীচু করে রইলেন। আবার বললেন ঠাকুর—'তুই গিয়ে মার কাছে বল।'

'সে আমি পারব না, আমার জন্য আপনাকেই বলতে হবে।'

শিষ্যের গুরুর নিকট দাবী, পুত্রের পিতার নিকট আবদার।

ঠাকুর আবার বললেন কানে কানে—'আজ মঙ্গলবার। রাত্রিতে মার ঘরে গিয়ে মার কাছে যা চাইবি তাই পাবি।'

'সত্যি!' জানতে চায় নরেন।

'হ্যাঁ সত্যি। দেখনা একবার চেয়ে।'

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। নিস্তব্ধ ভবতারিণীর মন্দির।

ঠাকুর বললেন—'যা এবার শ্রীমন্দিরে। লুটিয়ে পড় মায়ের পায়, আর প্রাণভরে চা।'

সংশয়-দোলায় দুলতে দুলতে প্রবেশ করলেন কালী-মন্দিরে। দেখলেন মায়ের রূপ। মনে হল—এ ত' পাথরের মূর্তি নয়, মাটির আধারে 'চিন্ময়ী প্রতিমা।'

কি হল কে জানে? জানেন নরেন্দ্রনাথ আর তাঁর গুরু।

বললেন—'মা, জ্ঞান বৈরাগ্য, বিবেক ভক্তি দাও মা; যেন সদাই তোমায় দেখতে পাই মা।'

নরেন্দ্র ফিরে এলেন; 'কি চাইলি?' জানতে চাইলেন ঠাকুর।

তাই ত, তিনি ত মা-ভাইয়ের কষ্ট দূর করার জন্য কিছু চাননি।

আবার গেলেন ঠাকুরের আদেশে।

কিন্তু এবারও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করতে পারলেন না। আবার গেলেন। একই ফল। দুঃখ-দৈন্যের কথা বলা হল না। কল্পতরুর কাছে কেউ কি কলা মূলো চাইতে পারে?

'কি, লজ্জা করল চাইতে?'

'হ্যাঁ, সত্যিই লজ্জা করল।'

হাসলেন ঠাকুর, কানে কানে বললেন—'আর ভয় নেই। তোর ভার মা নিয়ে নিলেন। মা বর দিলেন—তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন—'আমায় মার গান শিখিয়ে দিন।'

'আচ্ছা শিখে নে—

মা ত্বং হি তারা ত্রিগুণধরা পরাৎপরা,

আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।

তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আছ্য মূলে গো মা

আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা॥

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,

অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা॥

নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা হয়ে গেল মাতৃমন্ত্রে। তাঁর মন থেকে সাকার-নিরাকারের ভেদবুদ্ধি সব চলে গেল।

॥ তের ॥

মায়ের কৃপায় নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব চলে গেল। এটর্নী অফিসে কাজ করে আর কয়েকখানি বই-এর অনুবাদ করে কিছু কিছু উপায় হতে লাগল। তার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করলেন।

একদিন ঠাকুর বললেন—'পড়াশুনো ছেড়ে দিবি নাকি?'

নরেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—'যদি এমন কিছু থাকে যা খেলে এ পর্যন্ত যা শিখেছি সব ভুলে যাই, তা হলে প্রাণটা যেন সুস্থ হয়।'

ঠাকুর আবার বললেন—'সাধন করার সময় আমি অষ্ট ঐশ্বর্য পেয়েছিলাম, তা আমার কোনো কাজে লাগেনি। তুই নে, পরে অনেক কাজে লাগবে।'

'ওতে ভগবানকে পাওয়ার কোনো সুবিধা হবে কি?' জিজ্ঞেস করেন নরেন্দ্রনাথ।

'তা নয়, তবে ঐহিকের কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না।'

বুঝলেন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছলনা; বাসনার লোভ দেখাচ্ছেন ঠাকুর।

সোজা জবাব দিলেন—'তবে ওতে আমার দরকার নেই।'

এল ১৮৮৫ সাল। ঠাকুরের কঠিন পীড়া। গলার রোগ বেড়েই চলেছে। খাওয়ায় কোনো রুচি নেই। খেতে পারেন না কিছু। ক্ষীণ, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শরীর।

ভক্তরা নিয়ে এল তাঁকে কাশীপুরের এক বাগানবাড়িতে। কলকাতার পাশে। চিকিৎসার সুবিধা অথচ কলকাতার অসুবিধাগুলি সেখানে নেই।

ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা ভালভাবে করতে পারবেন বলে নরেন্দ্রনাথ আগস্ট মাসেই স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুর যখন এলেন, তখন তিনি বাড়িঘর ছেড়ে ঠাকুরের কাছেই এসে রইলেন।

সন্ন্যাসী শিষ্য, গৃহী ভক্ত সকলেই এসেছেন। বালক সন্ন্যাসীরাও এল স্কুল-কলেজ ছেড়ে। তাদের বাপ-মা তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, নরেন্দ্রনাথ ছেলেদের

অভয় দিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অভিভাবকদের প্রয়াস বিফল হল।

ওষুধপত্র, চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা কিছুরই ত্রুটি নেই। কিন্তু রোগ বেড়েই চলল। ঠাকুর যে লীলা সম্বরণ করবেন এ আশঙ্কা সকলেরই মনে জাগল।

সকলের সান্ত্বনা আছে, তারা গুরুর সেবা-শুশ্রূষা করতে পারছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের অদৃষ্টে সে সুযোগও নেই। ঠাকুর কিছুতেই তার সেবা নেবেন না। ঠাকুর কেবল বলেন —'তোর পথ আলাদা।'

নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের ওষুধ, পথ্য, শুশ্রূষার ব্যবস্থা দেখাশুনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হত।

কিন্তু আর এক বড় কাজ করে যেতেন দিনের পর দিন। সতীর্থদের নিয়ে শাস্ত্রের আলোচনা—দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতে থাকে।

কাশীপুরের বাগানবাড়ি আর শুধু রোগীর শুশ্রূষার জায়গা নয়, মঠ ও মহাবিদ্যালয় হয়ে উঠল। সাধন-ভজনের সঙ্গে চলল সমানে নানা শাস্ত্রচর্চা।

নরেন্দ্রনাথ গুরুর আদেশে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। অন্যান্য গৃহত্যাগী বালক-সন্ন্যাসীরাও একত্র থাকার ফলে পরস্পর আধ্যাত্মিক প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ এই কাশীপুরের বাগানবাড়িতেই ভাবী রামকৃষ্ণ-সংঘের গঠন হল।

একদিন ভক্তদের ডেকে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'সময় হ'য়েছে ; এবার তোদের সন্ন্যাস নিতে হবে।'

ডাক পড়ল নরেন্দ্রনাথের।

বললেন ঠাকুর—'তোমরা সম্পূর্ণ নিরভিমান হয়ে ভিক্ষার ঝুলিকাঁধে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে পারবে কি ?'

গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ সকলে ভিক্ষায় বেরলেন।

ভিক্ষায় যা মিলল রান্না করে ঠাকুরের সামনে এনে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

বালক-সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য দেখে ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

নরেন্দ্রনাথ অতীতযুগের যুগপ্রবর্তক সন্ন্যাসীদের জীবনী ও উপদেশ আলোচনায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। করুণার অবতার বুদ্ধদেবের অলৌকিক সাধনা ও করুণার বাণী তাঁর চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিত, তাঁর প্রাণে এনে দিত কি এক অপূর্ব সাড়া।

একদিন গভীর রাত্রির নির্জনতার মাঝে আর দুই গুরু ভাই-এর সঙ্গে গঙ্গা পার হয়ে এলেন, বালী স্টেশন। বালীতে ট্রেনে চড়ে চললেন বুদ্ধগয়া। সঙ্গীরা তারক—স্বামী শিবানন্দ ; আর কালী—স্বামী অভেদানন্দ। সেটা হল ১৮৮৬ সাল। তখন এপ্রিলের দারুণ গরম।

এদিকে কাশীপুরের বাগানে খোঁজ পড়ে গেল। কোথায় গেল নরেন্দ্রনাথ ? কোথায় গেল তারক ও কালী ? দিনের পর দিন রাতের পর রাত গেল। কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

শেষে সকলে ঠাকুরকে জানাল।

হেসে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'কেন ব্যস্ত হচ্ছিস্। সে ফিরে এল বলে। তার কি এখান ছেড়ে যাবার জো আছে।'

এদিকে গয়াধামে বোধিদ্রুমের মূলে প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন নিশ্চল, নিস্পন্দ। বহুক্ষণ বাদে একবার কেঁদে উঠলেন, তারপর আবার ধ্যানমগ্ন। কি দেখলেন, কি বুঝলেন আর কাকেও প্রকাশ করলেন না।

তিনদিন কঠোর তপস্যার পর ফিরে এলেন কাশীপুরে।

॥ চোদ্দ ॥

কাশীপুরে দোতালার ঘরে ঠাকুর রোগশয্যায়। পাশে নরেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। তখন গভীর রাত্রি।

'এত রাত্রে কেন? তুই কি চাস্?'

'শুকদেবের মত সদাই নির্বিকল্প* সমাধিত ভগবৎ প্রেমের আনন্দসাগরে ডুবে থাকতে চাই।'

ঠাকুর অসন্তোষের সুরে বললেন—'একথা বারবার বলতে লজ্জা করে না? কোথায় বটগাছের মত বড় হয়ে শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি, না নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্।

*নির্বিকল্প—যাতে ব্রহ্ম ভগবানের সঙ্গে অর্থাৎ যাঁকে জানতে হবে তাঁর সঙ্গে যে তাঁকে জানতে চায় তার এক হওয়ার মত অনুভূতি হয় সেই অবস্থাকে বলে 'নির্বিকল্প' অবস্থা।

এত তুচ্ছ। অত ছোট নজর করিস নি। শুধু নিজের মুক্তি, নিজের ভালর জন্য ব্যস্ত হওয়া কি তোর সাজে?'

নরেন্দ্রনাথ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললেন—'নির্গুণ সমাধি না হওয়া পর্যন্ত আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না। তা যদি না হয়, আমি ওসব কিছুই করতে পারব না।'

চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন ঠাকুর—'তুই কি ইচ্ছায় করবি। মা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তোর ঘাড় করবে।'

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছাড়ে না, কেবল কাঁদেন।

'আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে,' আশ্বাস দেন ঠাকুর।

একদিন সত্যই নরেন্দ্রনাথ সমাধিতে ডুবে গেলেন। তাঁর দেহ যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। সমাধি ভেঙ্গে যেতে অনুভব করলেন যে তাঁর মন ঐ অবস্থায় একেবারে কামনাশূন্য হলেও এক অলৌকিক শক্তি তাঁকে জোর করে বাহ্যজগতে নামিয়ে আনছে। অনুভব করলেন—

—বহুজনহিতায় বহুজনসুখময় কর্ম করব, অপরপক্ষে অনুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করব'—

মানবের এই কল্যাণকামনা নিয়েই তিনি ফিরলেন বাস্তব জগতে।

এই অনুভূতিই একদিন স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হ'য়েছিল—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥

॥ পনের ॥

১৮৮৬ সাল। জুলাই মাসের শেষ ভাগ।

ঠাকুরের গলার অসুখ ভীষণ হ'য়ে উঠল। কথা বলেন ফিস্‌ফিস্‌ করে। খেতে পারেন না কিছু।

কিন্তু ভক্তদের, বিশেষ করে বালক সন্ন্যাসীদের উপদেশ দেওয়ার বিরাম নেই।

নরেন্দ্রনাথকে ঘন ঘন ডাক।

একদিন দুয়ার বন্ধ করে নরেন্দ্রনাথকে কত কথা বললেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আর একদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদছেন। বললেন নরেন্দ্রনাথকে—'ওরে! আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।'

নরেন্দ্রনাথ নীরব। উভয়ের চোখে জল।

বললেন ঠাকুর—'তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্, এদের রক্ষা করিস্, সৎপথে চালাস্।

একটু পরে এক টুকরা কাগজ এনে দিল এক ভক্ত। লেখা আছে—'নরেন লোকশিক্ষা দিবে।'

বৈরাগী মন। বললে নরেন—'আমি পারব না।'

অন্তিম কণ্ঠে বললেন ঠাকুর—'করতেই হবে, তোর ঘাড় করবে।'

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার। এল কালরাত্রি।

ভাবছে নরেন্দ্র, ভাবছে একমনে—ভক্তরা ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য?

অন্তর্যামী ঠাকুর চোখ মেলে নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললেন—

'কী নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয়নি? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।'

নরেন্দ্রনাথ একেবারে চমকে উঠলেন। ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও নরেন্দ্রনাথ এমন চমকাতেন না।

রাত গভীর হয়ে এল।

ঠাকুরের কৃশ দেহখানি মৃদু মৃদু কাঁপছে। জীর্ণ দেহ পিঞ্জর ছেড়ে দেওয়ার সময় এসেছে।

নাসাগ্রে নিবদ্ধ স্থির দৃষ্টি, মুখে মৃদু হাসি। "কালি, কালি, কালি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মহা সমাধির মাঝে নশ্বর দেহ ছেড়ে চলে গেলেন।

নিভে গেল সব আলো। চলে গেলেন শান্তি সমন্বয়ের প্রচারক। 'যত মত তত পথ'-এর প্রদর্শক।

রইলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর অসমাপ্ত কর্মভার মাথায় করে।

॥ ষোল ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হওয়ার পর কাশীপুরের বাগান-বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ঐ বাড়ি ছেড়ে দিতে হল।

সন্ন্যাসীদের জন্য নরেন্দ্রনাথ ভাবনায় পড়লেন। তারা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে চলে যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ প্রচারের পথে বাধা হবে। সেজন্য একত্র থাকবার একটি স্থায়ী আবাসের বিশেষ দরকার।

ঠাকুরের পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এই রকম আবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। বরাহনগরে একটি বাড়ি ভাড়া করে দিলেন।

এতে অনেক সুবিধা হল সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেদের অভিভাবকরা তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কারও বি. এ. পরীক্ষা, কারও বাড়িতে প্রিয়জনের অসুখ। ঠাকুরের গৃহী-ভক্তরাও কেউ কেউ এরকম ফিরে যাওয়ার সমর্থন করতে লাগলেন।

তাঁরা অনেকেই নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগলেন। কারণ, সত্যই এসময় নরেন্দ্রনাথকে মধ্যে মধ্যে বাড়ি যেতে হত ও দু'একদিন থেকে যেতেও হত। তিনি তখনও সাংসারিক বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করতে পারেন নি। বাড়ি নিয়ে যে মামলা আরম্ভ হয়েছিল তার শেষ তখনও হয় নি।

এমনি সময়ে এল আর এক বিপদ, বেধে উঠল ভক্তদের মধ্যে এক আত্মকলহ। বিবাদটা ঠাকুরের দেহাবশেষ নিয়ে।

ঐ পবিত্র জিনিসটি তামার কলসে ভরা ছিল তরুণ সন্ন্যাসী শশী আর নিরঞ্জনের হাতে।

রামবাবু নিজের কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িখানি শ্রীগুরুর নামে উৎসর্গ করে সেখানে ঠাকুরের মৃত দেহাবশেষ রাখবার সংকল্প করলেন। অন্য গৃহী-ভক্তদেরও ঐ মত। কিন্তু সন্ন্যাসী-ভক্তরা কিছুতেই রাজী নয়।

নরেন্দ্রনাথের একদিনের কথায় বিবাদ মিটে গেল। তিনি বললেন—

"ঠাকুরের দেহাবশেষ নিজেদের অধিকারে থাকলেই কি তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হওয়া যায়, না ঐটিই তাঁর প্রতি ভক্তির প্রমাণ? এই দেহাবশেষ নিয়ে বিবাদ করা অপেক্ষা বরং এস, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি তাঁর অমূল্য উপদেশমত চলতে।"

শশী রাজী হয়ে গেল। ভগ্নাস্থির সামান্য কিছু রেখে তামার কলসীটি দিয়ে দিলেন রামবাবু প্রভৃতিকে কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যানে' সমাহিত করার জন্য।

গুরুভাইদের মনোমালিন্য অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিলেন নরেন্দ্রনাথ।

তরুণ সন্ন্যাসীরা আবার সব মঠে ফিরে এল। অভিভাবকরা নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে গেলেন।

নরেন্দ্রনাথের দায়িত্ব হল ভীষণ। তিনি হলেন শ্রীগুরুর অদর্শনে ব্যথিত ভক্তগণের একমাত্র আশাভরসা-স্থল।

আহার-নিদ্রা নেই, দেহের কষ্টের দিকে লক্ষ্য নেই, কুমার সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের পবিত্র জীবনী ও উপদেশ আলোচনা এবং নানা শাস্ত্র পাঠ, ধ্যান-জপে বিভোর হয়ে থাকতেন।

ভোর হওয়ার মুখেই নরেন্দ্রনাথের উদাত্ত আহ্বান শোনা যায়—

'হে অমৃতের পুত্রগণ! অমৃত পান করার জন্য তোরা জাগ্রত হ। জাগ্রত হ।'

তার পর সারাদিন চলত কঠোর তপস্যা।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন খুবই কষ্ট হ'চ্ছিল আহারাদি বিষয়ে। ভিক্ষাই ছিল অবলম্বন। উপবাসেও কোনও কোনও দিন কেটে যেত।

ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ, দাতা সুরেন্দ্রনাথ এসব জানতে পেরেই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনার হাত থেকে সন্ন্যাসী গুরুভাইদের অচিরে মুক্তি দিলেন।

এদিকে আর কোন অসুবিধা রইল না।

কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসীদের মনে তীর্থভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল। নরেন্দ্রনাথকে না বলেই গোপনে দু একজন চলেও গেল। এভাবে সাংসারিক অভিজ্ঞতাবিহীন বালক সারদা (পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত) তাঁকে না বলে চলে যাওয়ায় তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কদিন বাদ তার পত্র পেলেন। তার

মর্ম—এখানে থাকা নিরাপদ নয়, বাড়ির মায়ায় মতি বদলে যেতে পারে ; তাই হেঁটে বৃন্দাবন চললাম।

নরেন্দ্রনাথের মন গেল ভেঙ্গে। অসীমের ডাক তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। তিনিও ভারত মহাতীর্থ দেখে বেড়াবার সংকল্প করলেন।

॥ সতের ॥

১৮৮৮ সাল। একেবারে খালি হাতে বেরিয়ে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ। পরনে গেরুয়া, কাঁধে ঝুলি। হাতে একটি লাঠি।

এই হল নরেন্দ্রনাথের যাত্রাপথের সম্বল।

বিহার ও উত্তর প্রদেশের মাঝ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এলেন পবিত্র কাশীধাম। উঠলেন দ্বারকাদাসের আশ্রমে।

নিত্যকর্ম হল উদর-পূরণের জন্য ভিক্ষা-সংগ্রহ, দেবস্থান দর্শন, শাস্ত্রালাপ, ধ্যান জপ ও সাধুজন সঙ্গ। সন্ধ্যায় যখন ভাগীরথীতীরে পাথরের সিঁড়িতে বসে সান্ধ্য উপাসনার জন্য তৈরী হতেন আর চারিদিকের মন্দির হতে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজত, তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত দক্ষিণেশ্বর আর তার প্রাণস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

মনে হত আর ত তিনি বালক নরেন নন। কি গুরু দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ঠাকুর তাঁর উপর। আজ তাঁকে চালাতে হবে

বিরাট রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। আজ তিনি ঠাকুরের নির্দেশিত পথে **স্বামী বিবেকানন্দ**।

একদিন দেখা হয়ে গেল সুপণ্ডিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ হয়ে বললেন ভূদেববাবু—এ বয়সেই এত জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। কালে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হবেন এই তরুণ সন্ন্যাসী।

কাশীর বিখ্যাত সাধু শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। ঠাকুরের নিকট কতই না শুনেছিলেন এঁর কথা।

প্রশ্ন করলেন বিবেকানন্দ—'জীব আর ব্রহ্মে কোন প্রভেদ আছে কি?'

সাধু তখন মৌনব্রতী। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন—'ভেদ-বোধ ত নিজের মনে। মনকে সংহত করে সঁপে দাও নিজেকে ইষ্টের চরণে; জীবনেই ব্রহ্মকে অনুভূতি হবে।'

প্রণাম করে চলে এলেন স্বামীজী। গেলেন শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দের আশ্রমে। কথায় কথায় সাধু বললেন—'কামিনী-কাঞ্চন কেহই একেবারে ত্যাগ করতে পারে না।'

শুনে জ্বলে উঠলেন স্বামীজী। কেউ পারে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন একেবারে ত্যাগ করেন নি। জুড়ে দিল তর্ক সেই বিখ্যাত সাধুর সঙ্গে উপস্থিত বহু পণ্ডিত ও বড় বড় লোকের সামনে।

শেষে উদারহৃদয় সাধু বললেন—'এর কণ্ঠে সরস্বতী আরূঢ়া। এর হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত।'

আর কাশীবাস নয়। ফিরে এলেন স্বামীজী বরাহনগরে।

মঠে কি আনন্দ! কত উপদেশ দিতে লাগলেন স্বামীজী মঠের সকলকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী—বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সব এক দেখে এলেন বিশ্বনাথের মন্দির-দুয়ারে। ভাষা আলাদা, আচার আলাদা; কিন্তু এক ভক্তিভাবে ভাবুক হয়ে সবাই মিলেছে দেবতার মন্দিরে।

এই ঐক্যের মহিমা প্রচার করতে হবে। সেই শিক্ষাই দিতে লাগলেন গুরুভাইদের।

দেখতে হবে, জানতে হবে এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষকে। বুঝতে হবে তার কোটি কোটি নরনারীর বেদনা, অভাব, দুঃখ, দৈন্য।

সন্ন্যাসীর নিজের মুক্তির কামনা হবে গৌণ, এই মূক নরনারীর মুক্তি এনে দেওয়াই হ'ল মূল লক্ষ্য।

আবার শুনতে পেলেন স্বামীজী বিশ্বেশ্বরের আহ্বান।

চললেন স্বামীজী আবার কাশীধাম।

॥ আঠারো ॥

কাশী হতে তীর্থযাত্রা সুরু হল স্বামীজীর। দণ্ড-কমণ্ডলু-সম্বল স্বামীজী উত্তরভারতের নানা স্থানের মাঝ দিয়ে উপস্থিত হলেন সরযূনদীর তীরে, সীতারামের স্মৃতিতে ভরা সেই অযোধ্যায়।

অযোধ্যায় শ্রীশ্রীরামনাম কীর্তনে কিছুদিন কাটিয়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রায় তাজমহল দেখে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। সেখানে লালাবাবুর কুঞ্জে অতিথি হ'য়ে ছিলেন। এখানে দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবনের কাছাকাছি এসেছেন এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি তামাক খাচ্ছে। স্বামীজীর পূর্ব অভ্যাসমত তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হল। লোকটিকে কল্‌কে চাইলেন, কিন্তু সে বলল—'মহারাজ, ম'য় ভাঙ্গী হ্যায় (আমি মেথর)।' আজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়। কল্‌কে নেওয়া হল না। একটু পরেই জ্ঞান হল—'একি করছি। জাতি, কুল, মান সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছি, তবু মেথর শুনে এ বিচার কেন?'

তখুনি ফিরে এলেন স্বামীজী। ভাঙ্গী ভাইকে দিয়ে আর এক কল্‌কে তামাক সাজিয়ে খেলেন।

আর এক দিনের অদ্ভুত ঘটনা—

পরনের সম্বল কৌপীনখানি ধুয়ে তীরে শুকোতে দিয়ে তিনি রাধাকুণ্ডে স্নান করতে নামলেন। স্নান সেরে দেখেন কৌপীন নেই।

চারদিক চেয়ে দেখেন কৌপীন আছে গাছের উপর এক বানরের হাতে।

কি উপায়! কি পরে যাবেন সহরে এ অবস্থায়! এ কি রাধারাণীর পরীক্ষা!

স্থির করলেন, যতক্ষণ না লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা হয় তিনি বনপথেই চলবেন, অনশনেই থাকবেন।

চলেছেন বনপথে, এমন সময় কে ডাকল পিছন থেকে। গ্রাহ্য নেই; চলেছেন। কিন্তু যিনি ডাকছিলেন তিনি ছাড়বার পাত্র নন। ধরে ফেললেন স্বামীজীকে। নিতে হল তাঁর কাছ থেকে কিছু খাওয়ার আর নূতন এক গৈরিক বসন।

ফিরলেন স্বামীজী। এসে দেখেন রাধাকুণ্ডের তীরে পড়ে আছে তাঁর কৌপীন; যেমন ছিল তেমনি।

বিস্ময়ে মুগ্ধ হলেন স্বামীজী; লীলাময়ের একি লীলা! চোখে ঝরতে লাগল জল। আনন্দে করতে লাগলেন কৃষ্ণগুণ-গান। গীতায় তিনি মিথ্যা বলেন নি—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্', 'ভক্তের প্রয়োজনায় সবকিছু আমি বয়ে নিয়ে যাই গো ভক্তের কাছে।'

বৃন্দাবন ছেড়ে চললেন স্বামীজী। হেঁটেই চলছেন। যখন পাথেয় জুটত রেলে যেতেন, নচেৎ বরাবর পায়ে হেঁটে।

পথে এলেন হাতরাসে। অতি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত। বিশ্রাম করছেন পথের ধারে।

হাতরাস স্টেশনের স্টেশনমাস্টার শরৎ গুপ্ত কাজ সেরে ফিরছেন। মুগ্ধ হলেন সন্ন্যাসীর মূর্তি দেখে। বললেন—দয়া করে চলুন আমার ঘরে, বিশ্রাম ও আহার করবেন।

স্বামীজী চললেন শরৎচন্দ্রের গৃহে। শরৎচন্দ্র স্বামীজীর শিষ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর কাছে সকল সময় থাকলেন।

একদিন স্বামীজী গাইছেন—

বিদ্যা যদি লভিতে চাও
চাঁদ মুখে ছাই মাখ,
নইলে এই বেলা পথ দেখ।

শরৎ কেঁদে আকুল। ভিক্ষার ঝুলি আর গৈরিক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্বামীজীর পিছনে। নূতন সন্ন্যাসী 'সদানন্দ'কে সঙ্গে নিয়ে চললেন স্বামীজী হৃষীকেশ।

হৃষীকেশে খুব অসুস্থ হলেন সদানন্দ। তাকে নিয়ে ফিরে এলেন স্বামীজী হাতরাসে। নিজেও পড়লেন জোর অসুখে। সুস্থ হ'য়ে উভয়ে এলেন বরাহনগর মঠে।

॥ উনিশ ॥

আবার ফিরেছেন স্বামীজী মঠে। ঠাকুরের সকল গৃহী ভক্তই আনন্দে বিভোর।

জোর আলোচনা চলতে লাগল আবার নানা শাস্ত্রের— বেদান্ত, উপনিষদ, যোগ, সমাধি।

কিন্তু আলোচনা একমুখী নয়। আত্মমুক্তির সঙ্গে ভাবতে হবে সেবা, কর্ম ও ভক্তির কথা। শুধু নিজের মুক্তি, সে ত স্বার্থপরের চিন্তা, ঠাকুর বারবার বলে গেছেন। মুক্তি দিতে হবে সকল নরনারায়ণকে, মুক্ত করতে হবে দেশকে,

দুর্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষকে। দু'কূল বজায় রাখতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিষ্যকে, ভক্তবৃন্দকে।

স্বামীজী সেবাব্রতে দীক্ষা দিলেন সমস্ত গুরুভাই ও ভক্তদের।

প্রায় এক বছর এভাবে স্বামীজী হয় বরাহনগর মঠে, নয় কলকাতা বাগবাজার বলরাম বসুর বাড়িতে কাটান। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে তিনি কলকাতা ত্যাগ করতে পারেন নি।

ঐ মাসে তিনি বৈদ্যনাথ যান। সেখান হতে কাশী হয়ে তিনি ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাসে গাজীপুরে আসেন। এখানে মহাতপস্বী ও জ্ঞানী পাওহারী বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে স্বামীজী মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি সুদূর পর্বতগুহায় থাকতেন। সেখানে নিশীথে দীক্ষা নেওয়া স্থির হয়। কিন্তু পর পর সাতাশ দিন চেষ্টা করেও প্রতি রাত্রিতে যাত্রাকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন হওয়ায় এই দীক্ষা সম্ভব হয়নি।

গাজীপুর থেকে পত্র লিখলেন—'আর কোন মিঞার কাছে যাব না। শ্রীরামকৃষ্ণই আমার একমাত্র আরাধ্য। তাঁর জুড়ি আর নেই। আমি তাঁরই ক্রীতদাস।'

কাশী এলেন। সেখানে ঠাকুরের পরম ভক্ত, রামকৃষ্ণ-সংঘের পরম সহায় বলরাম বসুর মৃত্যুসংবাদ পান। স্বামীজীকে শোকে মুহ্যমান দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছিল।

'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।'

তিনি সে সময় যে উত্তর দেন তাতে রামকৃষ্ণসংঘের সন্ন্যাসীদের স্বরূপ বেশ বোঝা যায়।

'সন্ন্যাসীর কি হৃদয় বলে জিনিস থাকতে নেই? পাথরের মত অনুভূতি নেই এমন সন্ন্যাসজীবন চাই না। প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্য অন্যের চেয়ে বেশী অনুভব করেন। আর, ইনি ত গুরুভাই।'

বলরাম বাবুর শোককাতর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য স্বামীজী আবার কলকাতা ফিরে এলেন। বরাহনগর মঠের সুব্যবস্থাও অন্যতম লক্ষ্য।

বিপদের উপর বিপদ। মঠের পরম হিতৈষী সুরেন মিত্তির মশায় ২৫শে মে পরলোকে গেলেন। মঠের খরচ তিনিই বেশীর ভাগ চালাতেন।

ঠাকুরের কৃপায় মঠের পরিচালনার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মাত্র দু'মাস ছিলেন মঠে। তারপর আবার চঞ্চল হল মন।

১৮৯০। জুলাই মাস। শ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ নিয়ে বের হলেন তীর্থযাত্রায়।

ভাগলপুর হতে দেওঘর, দেওঘর হতে কাশী।

কাশী ছাড়ার সময় বলে গেলেন—'আমি যখন ফিরে সমাজের উপর বোমার মত ফেটে পড়ব তখন সমাজ আমার অনুগমন করতে বাধ্য হবে।'

তারপর অযোধ্যা ও নৈনিতাল হয়ে কেদারবদরীর পথে চললেন। অলকানন্দাতীরে কর্ণপ্রয়াগে গুরুভাই স্বামী

তুরীয়ানন্দের আশ্রমে মিলিত হলেন অন্যান্য তীর্থযাত্রী গুরু-ভাইদের সঙ্গে। তারপর স্বামী অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার জন্য দেরাদুন হয়ে হৃষীকেশে এসে বাস করতে লাগলেন। অনেক সময় হিমালয়ের গুহায় বসে ধ্যান তপস্যা করতেন।

দীর্ঘ পথশ্রম ও দারুণ ঠাণ্ডায় তপস্যা সহ্য হল না স্বামীজীর শরীরে। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

একদিন রোগী একেবারে সংজ্ঞাহীন। আর আশা নাই। গুরুভাইরা একেবারে অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় এক অজানিত সাধুর আবির্ভাব। একেবারে অপ্রত্যাশিত। একটু ওষুধ খাইয়ে আর সন্ন্যাসী ভাইদের অভয় দিয়ে চলে গেলেন।

সুস্থ হয়ে উঠলেন স্বামীজী। বলবেন—'অজ্ঞান অবস্থায় কি অনুভব করলাম শোন, অনেক কাজ বাকি। তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মরা হবে না।'

কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ ঘুরে তার সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। সুতরাং হিমালয়ের আকর্ষণ আর তাঁকে ধরে রাখতে পারল না।

পঞ্চনদে অর্থাৎ পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হলেন। সে যে আর্যদের আদিনিবাস; একদিন সামনিনাদমুখর ছিল। গুরু-ভাইরাও তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন। সকলে মিলিত হলেন মীরাটে। সেখানে শেঠজির উদ্যানগৃহ হয়ে উঠল দ্বিতীয় বরাহনগরের মঠ।

এখান থেকেই স্বামীজী গুরুভাইদের মায়া কাটাতে মনস্থ করলেন।

বুঝিয়ে বললেন সবাইকে—'আমার জীবনের ব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি একলা থাকব। তোমরা আমার সঙ্গ ছাড়।'

॥ কুড়ি ॥

১৮৯১ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামীজী এলেন আলোয়ারে, মীরাট থেকে। মহারাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাঙ্গালী ডাক্তারবাবুর বাড়িতে প্রথম আশ্রয় মিলল। ধর্ম বিষয়ে আলাপ-আলোচনার অসুবিধা হত ছোট কামরাটিতে। তাই দেখে অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁর বাড়িতে যেয়ে উঠলেন স্বামীজী। ইংরাজি, সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানীতে তাঁর অনর্গল কথাবার্তা শুনে সকলেই মুগ্ধ হতেন। জনসমাগম ক্রমশঃই বেশী হতে লাগল। একদিন একজন প্রশ্ন করলেন—'বাবুজী! আপনি গেরুয়া পরেন কেন?'

উত্তর দিলেন—'গেরুয়া ভিক্ষুকের পরিধেয়। আমি যদি আপনাদের মত বেশ ধারণ করে ঘুরি, ভিক্ষুকরা আমাকে ভিক্ষা চাইবে; কিন্তু আমার ত কিছু দেওয়ার সামর্থ্য নেই—প্রার্থীকে নিরাশ করতে হলে দুঃখ পাব। গেরুয়া পরা থাকলে তারাও আমাকে তাদের মত মনে করে আর ভিক্ষা চাইবে না।'

ক্রমশঃ আলোয়ার রাজ্যের দেওয়ান স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন, তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মহারাজ মঙ্গল সিংহ তখন কয়েক মাইল দূরে এক প্রাসাদে ছিলেন। পরের দিন তিনি আলোয়ারে ফিরে এলে দেওয়ানের অনুরোধে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আলোয়ারে এক দিনের ঘটনা —

একদিন মহারাজ জানতে চাইলেন—'স্বামীজী! আপনি একজন বিদ্বান্ মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। ইচ্ছা করলে আপনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন। তবে এ ভিক্ষাবৃত্তি নিয়েছেন কেন?'

নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী স্বামীজী মধুর স্বরে উত্তর দিলেন—'মহারাজ, বলতে পারেন আপনি রাজকার্য অবহেলা করে বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটান কেন?'

রাজার কর্মচারীরা এই প্রশ্নে সাধুর প্রতি দুর্ব্যবহারের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ একটু নীরব থেকে বললেন,—কেন করি বলতে পারি না, তবে ঐরকম করতে ভাল লাগে।'

স্বামীজী হেসে বললেন—'মহারাজ, আমারও সেই রকম ভাল লাগে বলে ফকিরি করে ঘুরে বেড়াই।'

মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন,—'মাটি, কাঠ, পাথর বা ধাতুর মূর্তিতে অপরের মত পূজা করতে পারি না, ঐগুলিতে

আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা আসে না, এতে কি পরকালে আমায় কষ্ট পেতে হবে?'

স্বামীজী উত্তর করলেন—'যার যেমন বিশ্বাস, তার জন্য পরকালে শাস্তি পেতে হবে কেন?'

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত। একি বলেন স্বামীজী? মূর্তি-পূজার সম্বন্ধে কিছুই বললেন না ত!

সেই ঘরে মহারাজের একখানা প্রতিকৃতি টাঙ্গানো ছিল। সেটি নামিয়ে আনতে বললেন স্বামীজী। আলোকচিত্রটি নামিয়ে আনা হল।

স্বামীজী বললেন—'দেওয়ানজী, এই ছবিটার উপর থুতু ফেলুন।'

বিস্ময়ে ভয়ে শিউরে উঠল সকলে—কি না কি অঘটন ঘটে!

'এখানে আর কেউ আছেন যিনি এই ছবির উপরে থুতু ফেলতে পারেন?'—জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজী।

দেওয়ানজী বললেন,—'বাবাজী মহারাজ! আপনি বলেন কি? মহারাজের ছবির উপর আমরা থুতু ফেলতে পারি কি?'

তখন স্বামীজী বললেন—'মহারাজের ছবি হোক্ না, তাতে কি আসে যায়? এতে ত আর মহারাজ স্বয়ং নেই! এ ত একখানা কাগজ মাত্র।'

তারপর মহারাজের দিকে চেয়ে আবার বললেন—'মহারাজ, এঁরা আপনার ছবিতে থুতু ফেলতে পারলেন না আপনার প্রতি

অসম্মান দেখান হবে বলে। কারণ, ছবির মূর্তি ত আপনারই। এঁরা আপনার অনুরক্ত সেবক ; এঁরা আপনাকে বা ছবিখানিকে সমান সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। ঠিক সেই রকম মাটি, কাঠ বা পাথরের মূর্তিকে ভক্তরা সেই সেই দেবতা মনে করেই পূজা করেন। কোথাও কাকেও বলতে শুনিনি 'হে প্রস্তর! আমি তোমার পূজা করছি, আমার উপর প্রসন্ন হও।' মহারাজ, ভগবান অনন্ত, সকল জনের উপাস্য—ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব অনুসারে তাঁকে বিভিন্ন প্রকার ভাবে উপাসনা করে থাকেন।'

বলতে বলতে ভাবে মগ্ন হয়ে পড়লেন স্বামীজী। তাঁর মুখে চোখে ফুটে উঠল অপূর্ব জ্যোতি। এগিয়ে এলেন মহারাজ মন্ত্রমুগ্ধের মত। বলতে লাগলেন—'প্রভু! আজ আমার চোখ খুলল। মূর্তি-উপাসনার রহস্য বুঝতে পারলাম।' এগিয়ে এসে লুটিয়ে পড়লেন স্বামীজীর পদপ্রান্তে। গদগদ স্বরে বললেন—'স্বামীজী, দয়া করে আমায় আশীর্বাদ করুন।'

স্বামীজী বললেন—'পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ কাকেও অনুগ্রহ করতে পারেন না। আপনি তাঁর শরণ নিন। তিনি নিশ্চিত আপনাকে কৃপা করবেন।'

আলোয়ার থেকে পাণ্ডুপোল হয়ে এলেন স্বামীজী জয়পুর। থাকলেন রাজবাড়িতে।

তাঁকে খুঁজে খুঁজে এলেন অখণ্ডানন্দ। কিন্তু তাঁকে ফিরে যেতে হল চোখের জল ফেলে। বললেন স্বামীজী—'তুমি

আমার অনুসরণ করে ভাল করনি। এখনি এখান হতে চলে যাও।' গুরুভাইদের প্রতি নির্মম হওয়ার পিছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য আছে কে জানে!

এখানে জয়পুররাজের এক সভাপণ্ডিতের ব্যাকরণে অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর কাছে পাণিনি ব্যাকরণ পড়তে সুরু করলেন। কিন্তু প্রথম সূত্রটির ব্যাখ্যা তিন দিনেও আর হল না। পণ্ডিত বললেন—আমার দ্বারা আপনার আর কিছু হবে না।

পান আহার সব ত্যাগ করে বসলেন স্বামীজী। অটল সংকল্প। এক প্রহর পরেই পণ্ডিতজীর কাছে এসে সূত্রের অতি সরল ব্যাখ্যা করে দিলেন স্বামীজী। পণ্ডিতজী অবাক্। যোগীর পক্ষে সবই সম্ভব। বরাহনগরে পাণিনি-সভা ছিল। আর দু সপ্তাহ পণ্ডিতজীর নিকট পাণিনির মূল কথা সব শেষ করে ছেড়ে এলেন জয়পুর।

আজমীর পিছনে ফেলে মনোহর আবু পাহাড়ের এক গুহায় অবস্থান করতে লাগলেন স্বামীজী। সেখানে দেখা হল এক মুসলমান উকীলের সঙ্গে। তাঁর চেষ্টায় সেখানের খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে হল যোগাযোগ। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ—'জীবন কি, স্বামীজী?'

উত্তর করলেন স্বামীজী—'বাইরের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীব নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করে, তাকেই বলে জীবন।'

'শিক্ষা কি?' মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন

স্বামীজী—কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জাগত করার নামই শিক্ষা।'

মহারাজের অনুরোধে এলেন মহারাজের রাজ্যে। ধর্মপ্রাণ মহারাজ অজিত সিংহ হলেন স্বামীজীর শিষ্য।

অপুত্রক রাজা একদিন গুরুর নিকট পুত্র পাওয়ার আশীর্বাদ প্রার্থনা জানালেন।

মনে মনে খুশী না হ'লেও কাতর আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলেন না স্বামীজী। বললেন—'শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'

অনেকদিন থাকা হল খেতড়িতে। আর না, আবার ভ্রমণ সুরু করলেন। কিন্তু মহারাজের ছেলে হওয়ার পর আবার আসতে হ'য়েছিল একবার।

॥ একুশ ॥

মরুময় গুজরাট প্রদেশ পায়ে হেঁটে পার হয়ে, ক্রমে আহ্মেদাবাদ, লিম্বডি (লিমড়ি), জুনাগড় ভোজ, ভেরাওল ও প্রভাস অতিক্রম করলেন। তারপর পথে সোমনাথের বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে এলেন পোরবন্দরে।

পোরবন্দরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় স্বামীজীর পড়ার ইচ্ছা আবার জেগে উঠল। পণ্ডিতজীর

কাছে পাণিনির মহাভাষ্য এবং বেদান্তের ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে লাগলেন।

এখানেই প্রথম তাঁর সাগরপারে যাওয়ার কথা উঠে। পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গ বলেছিলেন—'স্বামীজী। এদেশে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করে আপনি বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার উদার ভাব ও মত আমাদের দেশের লোক দেরীতে বুঝবে। এখানে অকারণ শক্তিক্ষয় না করে আপনি পাশ্চাত্য দেশে যেয়ে প্রচার করুন। সে দেশের লোক প্রতিভা ও মহত্ত্বের সম্মান করতে জানে। আপনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর এই সনাতনধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক নিক্ষেপ করে এক অভিনব যুগান্তর আনতে পারবেন।'

স্বামীজী বললেন—'প্রভাসে একদিন সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সাগরের ঢেউ দেখছিলাম। হঠাৎ যেন মনে হল এই বিক্ষোভিত সমুদ্র পার হয়ে আমাকে কোন দূরদেশে যেতে হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে বুঝতে পারি না।'

পোরবন্দরে গুরুভাইরা আসতে আরম্ভ করেছেন দেখে স্বামীজী ঐ স্থান ছেড়ে দ্বারকা, মাণ্ডবী, পালিটানা প্রভৃতি ঘুরে বরোদায় এলেন। সেখানের দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই-এর অতিথি হলেন। বরোদায় প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন; কেবল মাঝে মাঝে দু' একদিনের জন্য মধ্যভারতের কয়েকটি জায়গা দেখতে যান।

এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের প্রকৃত পরিচয়

পাওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাদের খবর জানতে, তাদের দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞতার প্রতিকার করার ব্যবস্থা করতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি সে সময় বুঝেছিলেন যে এবিষয়ে রাজা-মহারাজদের এগিয়ে আনতে পারলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাই ত তাঁর আবাস ছিল ধনীর অট্টালিকা হতে দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্যন্ত।

বরোদা থেকে খণ্ডোয়া হয়ে এলেন বোম্বাই সহরে। সেখানের ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের অতিথি হন।

বোম্বাই থেকে একদিন পুণা যাচ্ছিলেন স্বামীজী। ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে দেখলেন তিনজন মারাঠী যুবক সহযাত্রী। তাঁরা খুব জোর তর্ক করছেন। তর্কের বিষয়—সন্ন্যাসী। দু'জন বলছেন—সন্ন্যাসীগুলোই শেষ করে দিল দেশটাকে, ভণ্ড জুয়াচোরের দল। তৃতীয় যুবক প্রতিবাদ করে ভারতের সুপ্রাচীন সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীদের মহিমা কীর্তন করছিলেন। ইনিই লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। তাঁকে সমর্থন করে ধীরভাবে ইংরাজীতে বললেন স্বামীজী—'যুগে যুগে এই সন্ন্যাসীরাই ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জাতীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রচার করে আসছেন, এই আদর্শকে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও শিষ্য-পরম্পরায় রক্ষা করে আসছেন। ভণ্ড স্বার্থপর লোকের হাতে কখনও কখনও সন্ন্যাস লাঞ্ছিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই ব্যক্তিবিশেষের প্রতারণার জন্য সমস্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে দায়ী করা উচিত কি?

সন্ন্যাসীদের জন্যই ভারত তার আপন সত্তা লয়ে আজও জীবন্ত। কত মত, কত পথের আবির্ভাব হল। বাহির থেকেও কত শত্রু এল। কিন্তু ভারতের অধ্যাত্মচেতনা নষ্ট করতে পারল কি?'

এই ইংরাজি-জানা সাধুর গভীর পাণ্ডিত্য ও বচননৈপুণ্য তিনজনকেই, বিশেষ করে তিলক মহারাজকে মুগ্ধ করে দিল।

পুণা স্টেশনেই নেমে তিলক মহারাজের অনুরোধে স্বামীজী তাঁরই বাড়িতে অতিথি হলেন। যে কয়দিন এখানে ছিলেন উভয়ের মধ্যে পরাধীন ভারতের বিবিধ সমস্যার আলোচনার সুন্দর সুযোগ হয়েছিল।

এখান থেকে মহাবালেশ্বর গেলেন। এখানে লিমড়ির মহারাজ (ঠাকুরসাহেব) তাঁর গুরুকে রাস্তায় দীনবেশে দেখতে পেয়ে নিজের প্রাসাদে নিয়ে এলেন। কাতরভাবে বললেন— আর আপনাকে এরকম কষ্ট করার জন্য ছেড়ে দেব না। চলুন লিমড়িতে, আপনার স্থায়িভাবে থাকার বন্দোবস্ত করে দেব।'

'তা ত হওয়ার উপায় নেই। ঠাকুর আমার উপর এক মহান্ কাজের ভার দিয়ে গেছেন। যে পর্যন্ত সে কাজ শেষ না হবে, বিশ্রামের আশা বৃথা।'

মহাবালেশ্বর হতে মারগাম হয়ে এলেন স্বামীজী বেলগামে। সেখানে ছড়িয়ে পড়ল এই বাঙ্গালী সাধুর নাম।

তারপর এলেন বাঙ্গালোর, মহীশূর রাজ্যের রাজধানী।

মহীশূরের দেওয়ান স্যার আর.কে. শেষাদ্রি বাহাদুর স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে এত মুগ্ধ হলেন যে মহারাজের সঙ্গে অচিরেই

আলাপ করিয়ে দিলেন। মহারাজ মুগ্ধ হলেন এই তরুণ সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে।

মহারাজ অতি সরল ও উদার প্রকৃতির, চাইলেন স্বামীজীর পূজা করতে। সম্মত হলেন না স্বামীজী।

একদিন দেওয়ান বাহাদুরের সভাপতিত্বে রাজভবনে বসল এক বিচারসভা। বহু পণ্ডিত মিলে বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বিচার করবেন। লাগল ভীষণ তর্ক ও বাদানুবাদ। অনেক সময় গেল, সিদ্ধান্ত আর হয় না।

সভাপতির অনুরোধে উঠলেন স্বামীজী। সরল সুললিত সংস্কৃতে মধুর কণ্ঠে সব সংশয় মিটিয়ে দিলেন তিনি। প্রমাণ দিয়ে বললেন—'মতবাদগুলি পরস্পরের বিরোধী নয়, একে অন্যের পরিপূরক। সাধক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় যেভাবে সত্য অনুভূত হয়েছে তাই নিয়ে এক-একটি মতবাদ। একটিকে সত্য মনে করলেই যে অপরটি মিথ্যা হবে এমন কথা নেই।'

'সাধু', 'সাধু' বলে চমৎকৃত পণ্ডিতমণ্ডলী নবীন সন্ন্যাসীকে আশীর্বাদ জানালেন।

স্বামীজীর মহীশূর ছাড়বার সময় হল। মহারাজ বললেন—স্বামীজী, আপনার জন্য কিছু করতে পারলে বড়ই খুশী হতাম। কিন্তু আপনি ত কিছু নেবেন না।'

স্বামীজী তাঁর ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হতে দেশের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করে বললেন—'মহারাজ, আমাদের এখন প্রয়োজন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় আমাদের আর্থিক ও

সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু ইউরোপীয়দের দরজায় দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদলে বা ভিক্ষা চাইলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। ওরা যেমন বর্তমান উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেবে, বিনিময়ে আমাদেরও ওদের কিছু দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের দেবার মত এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছু কি আছে? তাই সময় সময় আমার ইচ্ছা হয়, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার করতে পাশ্চাত্ত্য দেশে যাই। যাতে এই আদান-প্রদান-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় চেষ্টা করা কর্তব্য। আপনার ন্যায় মহাকুল-প্রসূত শক্তিশালী রাজন্যবর্গ চেষ্টা করলে অল্পায়াসেই কাজ আরম্ভ হতে পারে। আপনি মহৎ কার্যে অগ্রসর হউন, ইহাই প্রার্থনা।'

স্বামীজী যদি পাশ্চাত্ত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যান, তাহলে মহারাজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত আছেন এবং তখনই কয়েক হাজার টাকা দিতে পারেন বলে এমন কথাও বললেন।

স্বামীজী কিছু না নিয়ে বললেন—'আমি হিমালয় হতে কন্যা কুমারিকা অবধি ভ্রমণ করার সংকল্প করেছি ...তারপর কি করব, কোথায় যাব এখন তার কিছুই স্থির নাই।'

বিদায়ের দিন মহারাজ স্বামীজীকে নানা মূল্যবান্ উপহার দিলেন। কিন্তু একটি চন্দনকাঠের হুঁকো ছাড়া স্বামীজী আর

কিছু নিলেন না। মহারাজ ও দেওয়ানজী অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন জেনে কোচিন পর্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট নিলেন।

দেওয়ানজী কোচিন রাজ্যের দেওয়ানের নামে এক পরিচয়-পত্র লিখে দিয়ে বললেন—'স্বামীজী, আমার একটি অনুরোধ রাখুন, কষ্ট করে পায়ে হেঁটে যাবেন না। কোচিনের দেওয়ানজী আপনার শ্রীশ্রীরামেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার সব সুবন্দোবস্ত করে দেবেন।'

মহীশূরের এই দেওয়ানের সঙ্গে স্বামীজীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আমরণ একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

॥ বাইশ ॥

স্বামীজী এলেন কোচিনে। কোচিনের রাজধানী ত্রিচূড়ে কয়েকদিন বিশ্রাম করে মালাবারের মাঝ দিয়ে এলেন স্বামীজী ত্রিবান্দ্রম, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী।

তারপর এলেন মাদুরায়। সেখানে পরিচয় হল রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির সঙ্গে। রাজা স্বামীজীর শিষ্য হলেন। অবাক্ হলেন রাজা এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখে দরিদ্র, নিপীড়িত ভারত ও ভারতবাসীর জন্য দুঃখ ও সহানুভূতির কথা শুনে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষাবিস্তার ও কৃষ্টির উন্নয়ন বিষয়ে সংসারত্যাগী সাধুর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে বিস্মিত হলেন। এই বিস্ময়ের জবাব দিলেন স্বামীজী প্রাণস্পর্শী ভাষায়—

'মুক্তি সন্ন্যাসীর লক্ষ্য হলেও ভারতের জনগণের উন্নতি-

সাধনের চেষ্টাও যে সেই মোক্ষলাভের সোপান, আমার গুরুর কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছি।'

মাদুরায় কয়েক দিন কাটিয়েই এলেন দক্ষিণ ভারতের কাশীধাম রামেশ্বর। দেখলেন, শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তি আর বৃহৎ বৃহৎ মন্দির।

তারপর এলেন কন্যাকুমারী। প্রণাম করলেন দেবীমূর্তির চরণে। বসলেন শিলাতলে।

কী অপরূপ দৃশ্য! ঊর্ধ্বে অনন্ত প্রসারিত নীল আকাশ, সম্মুখে বায়ুবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গমালা, পশ্চাতে মরু-গিরি-প্রান্তর-শোভিত ভারতমাতা। আর তারই সর্বশেষ তীর্থে প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট যোগমগ্ন সন্ন্যাসী, নব ভারতের আচার্য, পরিব্রাজকাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

সেটা হল ১৮৯২ সালের শেষভাগ।

কি ভাবছেন স্বামীজী!

চার বছর আগে বরাহনগরের মঠ ছেড়ে এসেছিল যে অশান্ত তরুণ নরেন্দ্রনাথ, আজ তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ভাবতেন, দেশের ধনীরা, রাজা-মহারাজেরা বৃথা বিলাসে যে অর্থ ব্যয় করেন তার কতক অংশও যদি দেশের শিক্ষা-বিস্তার ও কৃষির উন্নতিতে নিয়োজিত করেন তা হ'লে দেশের ও জাতির কল্যাণ অনিবার্য। কিন্তু আজ তিনি ধনী, রাজা-মহারাজের চেয়ে অধিক নির্ভর করেন দেশের চরিত্রবান্ শিক্ষিত যুবকদের উপর। তাঁর ভাবনার ধারা বদলে গিয়েছে।

ধ্যানমগ্ন পরিব্রাজক ভারতের পদপ্রান্তে বসে আজ কি ভাবছেন! ভাবছেন শ্রীগুরুর কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশবাণী মাথায় করে সারা ভারতে ঘুরে এসেছেন। দেখেছেন ধনীর ধন, বিলাস ও ঐশ্বর্য। আবার আর একদিকে দেখে এলেন গরীবের ভাঙ্গা ঘর, জীর্ণ, শীর্ণ কঙ্কাল দেহ—কোটি কণ্ঠের আর্তনাদ 'অন্ন দাও, অন্ন দাও'। কারও প্রাণে নেই নৈতিক আর আধ্যাত্মিক চেতনা; অজ্ঞান, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এই সেই চির গৌরবময় ভারত। এই আমার প্রিয় মাতৃভূমি! 'ছিন্ন-বসন, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকা।' চোখের জলে ভেসে গেল সন্ন্যাসীর সৌম্য বদনমণ্ডল।

মনে পড়ল শ্রীগুরুর বাণী—'খালিপেটে ধর্ম হয় না, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা চাই।'

'এই অন্নহীনদের অন্নে জীবন ধারণ করে আমরা লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী এদের জন্য কি করছি? দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি। ধিক্! ধিক্!'

'দিতে হবে অন্নহীনের মুখে অন্ন, দূর করতে হবে অশিক্ষার অন্ধকার; দরিদ্রনারায়ণকে, মূর্খ নিরক্ষর নারায়ণকে মানুষ করে তুলতে হবে।'

'কিন্তু কেমন করে তা হবে? এ কাজে প্রথম চাই মানুষ, তারপর চাই অর্থ।'

এলেন। কিন্তু কিছু সময় তর্ক করার পর মুধলিয়র একবারে চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি অচিরে স্বামীজীর শিষ্য হলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল অতুলনীয় গুরুভক্তি দেখিয়ে গিয়েছেন। স্বামীজী তাঁকে আদর করে 'কিডি' বলে ডাকতেন এবং কিছুদিন পরেই তিনি সংসার ছেড়ে দিয়ে নরনারায়ণের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন। ইনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মাদ্রাজের উচ্চশিক্ষিতদের উপর এত শীঘ্র প্রভাব বিস্তারের কারণ, স্বামীজীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিবিহীন উদার ধর্মমত, সমবেদনায় ভরা মহান্ হৃদয় এবং যে'ই আশ্রয় চাইবে নির্বিচারে তাকে কোল দেওয়ার আগ্রহ।

ঠিক এই সময় যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগোতে এক বিরাট্ ধর্মসভার আয়োজন হচ্ছিল। ঘোষণা ছিল যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি ঐ সভায় যোগ দিতে পারবেন। স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যরা হিন্দুধর্মের মুখপাত্ররূপে তাঁকে ঐ মহাসভায় পাঠানর জন্য উদ্যোগী হলেন। ঐ উদ্দেশ্যে একদিন তারা পাঁচশ' টাকা সংগ্রহ করে এনে দিল গুরুজীকে। স্বামীজী কিন্তু নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে শিষ্যদের টাকা ফিরিয়ে দিলেন, বললেন—'আমি আঁধারে ঝাঁপ দেওয়ার আগে মার উদ্দেশ্য জানতে চাই। যদি আমার আমেরিকা যাওয়া তাঁর ইচ্ছা হয়, টাকা আপনি এসে যাবে, তোমাদের

আর এত চেষ্টা করতে হবে না। তোমরা এ টাকা দরিদ্র-নারায়ণদের মধ্যে বিতরণ কর।'

তাকিয়ে রইল সবাই অবাক্ হয়ে নির্লোভ সন্ন্যাসীর দিকে, বিলিয়ে দিল সব টাকা দরিদ্রদের মধ্যে।

এমন সময় ডাক এল হায়দ্রাবাদ থেকে; মন্মথবাবুর বন্ধু স্টেট ইঞ্জিনীয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।

১৮৯৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি। বিরাট অভ্যর্থনার মাঝে নামলেন গাড়ি থেকে স্বামীজী। প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন রাজা শ্রীনিবাস রাও, পণ্ডিত রতনলাল প্রমুখ হিন্দুগণ এবং শামসুল উলেমা সৈয়দ আলি বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর প্রমুখ মুসলমান নেতাগণ।

দুঁদিন পরে আমন্ত্রণ এল নিজাম বাহাদুরের শ্যালক নবাব স্যার খুরসিদ জঙ্গ বাহাদুরের কাছ থেকে। নিজামের প্রাসাদে এলেন স্বামীজী। নবাব বাহাদুরের হিন্দুধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি ভারতের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দেখে এসেছেন।

সাদর অভ্যর্থনার পর দু-ঘণ্টা ধরে আলোচনা হল—ধর্ম কি এবং ধর্মের মূল সূত্র কোথায়? হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম ও খ্রীষ্টান-ধর্ম—এই তিনের সমন্বয়-ভূমি দেখিয়ে বললেন যে তিনি সভ্য জগতের সামনে বেদান্তের সাহায্যে ধর্ম-সমন্বয় প্রচার করবেন স্থির করেছেন। স্বামীজীর বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে একদিন

সকল রকম ধর্মের কলহ কোলাহল দূর হবে এবং সকলেই নিজ নিজ ভাবে ভগবানের উপাসনা করবার সুযোগ পাবে।

নবাব বাহাদুর মুগ্ধ হলেন ও আনন্দিত হলেন। স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যদেশে যাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা খরচ দিতে চাইলেন। টাকাটা না নিয়ে স্বামীজী বললেন, 'পাশ্চাত্ত্যদেশে যাওয়ার জন্য ভগবানের আদেশ যদি ভবিষ্যতে পাই তাহলে আপনাকে জানাব।'

হায়দ্রাবাদ ছাড়ার পূর্বে মহবুব কলেজের পণ্ডিত রতনলালের সভাপতিত্বে স্থানীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের যে বিরাট সভা হয় তাতে স্বামীজী একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন; বিষয় ছিল 'পাশ্চাত্ত্য দেশে আমার বার্তা—'

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে স্বামীজী আবার মাদ্রাজে ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্য ও ভক্তরা তাঁকে শিকাগোর ধর্মসভায় পাঠাবার সঙ্কল্প ছাড়েননি। অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁরা রামনাদ, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে গেলেন।

তাঁদের আগ্রহ দেখে স্বামীজী বললেন—'তোমরা আমাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকা পাঠাতে চাও; আমিও জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে যেতে চাই। কিন্তু ঐ কাজে জনসাধারণের সম্মতি আছে কিনা তা জানতে হলে কেবল রাজা-মহারাজদের কাছে সাহায্য না নিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ কর। শিষ্যরাও গুরুর আজ্ঞা মাথায় করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে লেগে গেলেন। এই স্বার্থলেশশূন্য মাদ্রাজী

যুবকগণের অতুলনীয় গুরুভক্তি রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

'যাব কি না যাব?'—কে দেবে বল দোলাকুল চিত্তে!

স্বামীজী দেখলেন এক দিব্য স্বপ্ন এক গভীর রাতের গভীর অন্ধকারে—

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পূর্ণ দেহ নিয়ে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে চলেছেন, আর পিছনে ফিরে ফিরে ডাকছেন নরেন্দ্রনাথকে—'আয়, আয়, আয়; নির্ভয়ে আয়।'

দূর হয়ে গেল সব সংশয়।

কিন্তু শ্রীমার অনুমতি নিতে হবে ত। লিখলেন শ্রীমাকে।

শ্রীমায়ের উত্তর এসে গেল। তিনি দিয়েছেন সম্মতি। বললেন সে কথা শিষ্যবৃন্দকে। পূর্ণ উদ্যমে লেগে গেল তারা আবার।

সকল আয়োজন পূর্ণ। দু পাঁচ দিনের মধ্যেই যাত্রা করবেন যুগযাত্রী স্বামীজী।

এমন সময় হাজির খেতড়ি মহারাজের কাছ থেকে জগমোহন। স্বামীজীর আশীর্বাদে অপুত্রক রাজার পুত্র হয়েছিল। তার অন্নপ্রাশন। আশীর্বাদ করতে যেতেই হবে।

সব গোলমাল হয়ে গেল। অনেক বাদানুবাদ হল।

অবশেষে স্বামীজী রাজী হলেন। স্থির হল যে বোম্বাই হতেই স্বামীজী আমেরিকা যাত্রা করবেন, মাদ্রাজে আর ফিরবেন না।

চললেন স্বামীজী বোম্বাইএর পথে খেতড়ি। পথের দু'ধারে অগণিত ভক্ত, চোখের জলে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাচ্ছে।

বহুকষ্টে সামলালেন স্বামীজী নিজেকে। উঠলেন গাড়িতে। ট্রেন ছেড়ে গেল। ধীরে ধীরে স্টেশন অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ চব্বিশ ॥

মাদ্রাজ হতে খেতড়ি এসে রাজকুমারকে আশীর্বাদ করা হল, চললেন স্বামীজী বোম্বাইএর দিকে।

স্বামীজীকে জগমোহন প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিয়ে আসছিলেন। ঐ কামরায় এক বাঙালীভক্ত স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

এমন সময় এল এক শ্বেতাঙ্গ রেলের কর্মচারী, বাঙালী ভদ্রলোকটিকে নেমে যেতে বলল। তিনি নামলেন না। লাগল গোলমাল।

কথাবার্তার মাঝে সাহেব স্বামীজীকে 'তুম্' বলতে স্বামীজী তাকে 'আপ' বলতে উপদেশ দিলেন এবং তার নাম ও নম্বর চাইলেন। সাহেব একবারে দমে যেয়ে একরকম মাপ চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

স্বামীজী বললেন—'শিক্ষা ও সভ্যতায় আমরা কোনো জাতের চেয়ে হীন নই। কিন্তু আমরা নিজেদের হীন মনে করি বলেই বিদেশীরা আমাদের লাথি-ঝাঁটা মারে, আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।'

গাড়ি বোম্বাই পৌঁছল। আমেরিকা যাওয়ার আয়োজন হতে লাগল।

জগমোহন রাজার নির্দেশে খুব দামী পোশাক স্বামীজীর জন্য কিনেছেন জেনে তিনি প্রবল আপত্তি করলেন। শেষ পর্যন্ত রেশমের আলখাল্লা ও পাগড়ি তাঁকে পরতেই হল।

দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাঁর বেড়ান অভ্যাস, তাঁর পক্ষে এসব দামী জিনিস সামলাবার ভাবনায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

মাদ্রাজ থেকে এসে গেল শিষ্য পেরু মল।

জগমোহন আগে থেকেই জাহাজে একটি প্রথম শ্রেণীর ভাল কেবিন রিজার্ভ করে রেখেছিল। যাত্রার দিন এসে গেল।

শ্রীশ্রীগুরুর নির্দেশে যাত্রা করলেন আচার্য বিবেকানন্দ ত্যাগপবিত্র ভারতবর্ষ হতে ভোগবিলাসের লীলাভূমি পাশ্চাত্ত্য দেশের উদ্দেশে। জাহাজ ছাড়ল বোম্বাই বন্দর।

সেটা হল ৩১শে মে, ১৮৯৩ সাল।

কেন যাচ্ছেন স্বামীজী?

সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদেশীর ভুল ভাঙ্গাতে, ওর সার্বজনীন ভাবধারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে আধুনিক মনের উপযোগী করে প্রচার করতে, ভোগবিলাসী জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য দেশকে শান্তিময় ত্যাগের বাণী শোনাতে, আর সেই সঙ্গে নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসহীন, বিপথগামী, বিদেশীর পায়ের তলায় বসে ধর্মশিক্ষারত স্বদেশীয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে।

স্বামীজী নিজে এই প্রচার সম্বন্ধে উদাত্ত কণ্ঠে ইংরাজীতে যা বলেছিলেন তার মর্ম হল—

'আমি সেই ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছি, বৌদ্ধধর্ম যার বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম যার দূরবর্তী প্রতিধ্বনি মাত্র।'

॥ পঁচিশ ॥

জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে, বিশেষতঃ কাপ্তেনের সঙ্গে স্বামীজী দুদিনেই ভাব করে ফেললেন। নূতন খাওয়ার এবং নূতন রকম আচার-ব্যবহারও আয়ত্ত হয়ে গেল।

সাতদিন পর জাহাজ এল বৌদ্ধধর্মের দেশ সিংহলের রাজধানী কলম্বো। সেখানে ভগবান্ বুদ্ধের মন্দির আদি দেখে আবার জাহাজে চড়লেন। পথে মালয় উপদ্বীপের রাজধানী পেনাং ও পরে সিঙ্গাপুর বন্দর দেখে এলেন হংকং। সেখানে জাহাজ তিনদিন থাকায় দেখে এলেন চল্লিশ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ চীনের রাজধানী ক্যান্টন শহর।

কি দেখলেন চীনে? দারিদ্র্য। ভারত ও চীন দু'টি বিশাল দেশ প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু তার গৌরব অতীত দিনের কথা। বর্তমানে ভারতীয় ও চীনা উভয়ের দৈনিক অভাব মেটাতে এত ব্যস্ত যে সভ্যতার পথে এক পাও এগুতে পারছে না।

তারপর এলেন জাপানে। নাগাসিকি বন্দর। কী সুন্দর! আরও দেখলেন—ওসাকা, কিয়োটা, টোকিও শহর।

কী অপূর্ব! লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীর উচ্ছল প্রাণচেতনা। অশান্ত কর্মচাঞ্চল্য!

লিখলেন মাদ্রাজী বন্ধুদের ইয়াকোহামা হতে—

'এস, নিজ চোখে দেখে যাও—ক্ষুদ্র জাপানে, সগুজাগ্রত জাপান কেমন করে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিপুঞ্জের মধ্যে মর্যাদার আসন করে নিয়েছে।......আর তোমরা কি করছো? কেবল বাজে বকছো।......এস মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, সব জাত কেমন এগিয়ে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আবার ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে এস। ভারতমাতা অন্ততঃ এরকম হাজার যুবক বলি চান। মানুষ চান, পশু নয়।'

ইয়াকোহামা থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এলেন ভ্যাঙ্কুবর। তারপর ক্যানাডার মাঝ দিয়ে রেলপথে এলেন ঈপ্সিত শিকাগো শহর।

বিরাট্ শহর। অতিষ্ট হয়ে উঠলেন। একদিকে কুলি হতে আরম্ভ করে সকলে তাঁকে ঠকিয়ে টাকা নিতে লাগল; আর একদিকে গেরুয়া কাপড় ও পাগড়ির জন্য বিদ্রূপ, পথে চলাই মুশকিল। শেষে এক হোটেলে আশ্রয় নিয়ে সেদিনের মত পরিত্রাণ পেলেন।

সকালে উঠে চললেন বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখতে। কত

নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র, কী অপরূপ পণ্যসম্ভার! মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন, কত পিছিয়ে আছে সাধের ভারত।

তারপর ভীষণ দুর্ভাবনা। হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এল। এদিকে ধর্ম-মহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের আগে বসবে না; এতদিন খরচ চলবে কি করে? তার উপর, সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ—ধর্মের প্রতিনিধিরূপে নাম লেখাবার তারিখ চলে গেছে এবং প্রতিনিধি হওয়ার জন্য নিয়মিত পরিচয়পত্রও তিনি আনেন নি।

মন গেল দমে। শিকাগোর বিরাট ব্যয় বহন দুঃসাধ্য ভেবে এলেন বোস্টন শহরে।

পথে ট্রেনে আলাপ হল এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে, ধনে মানে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে মহিলাটি একজন নামী মহিলা।

স্বামীজী আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে এসেছেন শুনে মহিলাটি তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

এখানে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন—শীত, উপবাস ও অদ্ভুত পোশাকের দরুন লোকের বিদ্রূপ থেকে। কিন্তু মহিলাটি তাঁর বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন ভারতের এই অদ্ভুত জীবকে দেখানর জন্য।

শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি ক্রমশঃ যখন নিরাশ হচ্ছিলেন এমন সময় ঠাকুরের কৃপায় এক অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল। ঐ মহিলার বাড়িতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক রাইট সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রাইট সাহেব স্বামীজীকে ধর্মসভায় যোগ দেওয়ার

উপদেশ দিলেন ; উহাই বেদান্ত প্রচারের উৎকৃষ্ট সুযোগ বললেন। যেসব কারণে এবার তা সম্ভব নয় বলায় অধ্যাপক রাইট বললেন—'To ask you, Swami, for your credentials is like asking the Sun to state its right to shine.' (স্বামীজী, আপনাকে পরিচয়-পত্র চাওয়া মানে সূর্যকে তাঁর কিরণদানের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা।)

অধ্যাপক ধর্মসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর বন্ধু বনি সাহেবকে একখানি পত্র লিখে স্বামীজীকে দিলেন। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা ছিল—'দেখলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু-সন্ন্যাসী আমাদের সকল পণ্ডিতকে একত্র করলে যা হয় তার চেয়েও বেশী পণ্ডিত।'

স্বামীজী এই পত্র ও রাইট সাহেবের দেওয়া একটি রেলের টিকিট নিয়ে আবার শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করলেন।

ট্রেন এসে পৌঁছল অনেক রাত্রে। কিন্তু যেখানে যাওয়ার কথা সে ঠিকানা গেছে হারিয়ে। পরীক্ষা ও কষ্টের এখনো শেষ হয়নি।

দারুণ শীতে কোথাও পেলেন না আশ্রয়, কোথাও পেলেন না খাবার। অনাহারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে আবার এলেন স্টেশনে। একটা খালি বাক্স পড়ে আছে দেখে তাতেই কাটালেন সারারাত।

কারও কাছে কোনো সাহায্য ভিক্ষা করবেন না—এই সংকল্প নিয়ে বসে পড়লেন রাজপথের ধারে। শরণ নিলেন মানুষের নয়, শরণ্য শ্রীশ্রীগুরুর।

অভাবনীয় ব্যাপার। সামনের বড় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক সুন্দরী রমণী, জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধি?'

বিস্মিত, মুগ্ধ স্বামীজী সব কথা খুলে বললেন। রমণীটি অর্থাৎ মিসেস্ হেইল তাঁকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে তাঁর বিশ্রাম আদির সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। সকালের খাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে গেলেন ধর্ম-মহাসভার উদ্দেশে।

মায়ের মত করুণাময়ী এই রমণীর সাহায্যে স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে নেওয়া হল এবং তিনি প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকবার সুবিধা পেলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

১৮৯৩ সাল। ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কত ধর্মসম্প্রদায়ের সেরা প্রতিনিধিরা একত্র মিলেছেন। তাঁদের সামনে, হাজার উন্মুখ নরনারীর সামনে দাঁড়ালেন আচার্য বিবেকানন্দ। শুরু হল বক্তৃতা। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরান সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন জাতিকে অভিনন্দন জানালেন—'আমার মার্কিন ভাইবোনেরা'।

এই এক কথাতেই মুগ্ধ হল সাত হাজার শ্রোতৃমণ্ডলী। তিন মিনিট চলল করতালি।

তিনি কোনো বিশেষ ধর্মমতের কথা বললেন না। সকল ধর্মের সারকথা যাতে আছে সেই সার্বভৌমিক সনাতনধর্মের কথা বললেন। তাঁর শ্রীশ্রীগুরুর 'যত মত, তত পথ'-এর বাণীই ব্যক্ত করলেন *

শেষ হল প্রথম দিনের অধিবেশন। সকলকে স্বীকার করতে হল যে স্বামীজীই সেদিনের শ্রেষ্ঠ বক্তা ও আচার্য।

আবার ১৯শে হল স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রসিদ্ধ বক্তৃতা। পাদরিরা, বিশেষ করে তাঁর নিজের দেশের পাদরিরা, যা-তা বলে তাঁর নিন্দা প্রচার করতে লাগলেন। কর্তৃপক্ষ উত্তর দিতে বলায় ২২শে আর এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। তার পূর্বে আরও বক্তৃতা দিয়েছেন।

২৫শে এবং মহাসভার শেষ অধিবেশনে ২৭শে স্বামীজী আবার বক্তৃতা দেন।

মার্কিন দেশ বিবেকানন্দের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। অপরিচিত সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হওয়ার জন্য শত শত সুধী ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

সংবাদপত্রে শুধু তাঁরই কথা। New York Herald বললেন—'শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হয়, ধর্মমার্গে এহেন সমুন্নত জাতির নিকট আমাদের ধর্মপ্রচারক পাঠান নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা।'

---

* শিকাগোতে স্বামীজীর এই প্রথম বক্তৃতা পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

Boston Evening Transcript—লিখলেন—'তিনি প্রকৃতই একজন মহাপুরুষ, উদার, সরল ও জ্ঞানী। আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই গুণগৌরবে তাঁর সমকক্ষ নহেন।'

ভারতের 'মহাবোধি সোসাইটি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীধর্মপাল 'Indian Mirror' পত্রিকায় লিখলেন—'স্বামী বিবেকানন্দের বড় বড় প্রতিকৃতি রাস্তায় রাস্তায় লটকিয়ে রাখা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হাজার হাজার পথিক ঐ প্রতিকৃতিগুলির প্রতি ভক্তিভরে সম্মান দেখিয়ে চলে যাচ্ছে।'

পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও ধর্মের উপর আচার্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে মিঃ স্নেল লণ্ডনের বিখ্যাত Pioneer পত্রিকায় যে বিবরণ দেন তার কিছুটা এখানে দেওয়া হল। মিঃ স্নেল শিকাগো ধর্মসভার অংশ বিশেষ বিজ্ঞানসভার সভাপতি ছিলেন।

" 'হিন্দুধর্ম' এই মহাসভা ও জনসাধারণের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে অপর কোনো ধর্মসংঘ সেরূপ পারেন নি। হিন্দুধর্মের একমাত্র আদর্শ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দই মহাসভায় অবিসংবাদিতরূপে সবচেয়ে লোকপ্রিয় ও প্রভাবান্বিত। তিনি এই ধর্ম মহামণ্ডলীর বক্তৃতামঞ্চে এবং বিজ্ঞানশাখার সভায় প্রায়ই বক্তৃতা করেছেন। * * * * খ্রীষ্টীয়ান অথবা অখ্রীষ্টীয়ান কোন বক্তাই কোন সময়েই এত উৎসাহের সঙ্গে সমাদর পান নাই। * * * * অত্যন্ত গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ানও তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—স্বামীজী মানুষের মধ্যে অতিমানুষ।"

॥ সাতাশ ॥

ধর্মমহাসভা শেষ হওয়ার পর একটি 'বক্তৃতা কোম্পানি'র অনুরোধে স্বামীজী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁর নতুন কথা আমেরিকাবাসীরা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগলেন এবং তিনি সর্বত্র সম্মান ও অভ্যর্থনা পেতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। প্রচারক ও কতকগুলি পরশ্রীকাতর হীনমনা ব্যক্তি এবং পাদরিরা তাঁর পিছনে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সব অসৎ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

তুলসীদাসজী ঠিকই বলেছেন—হাতী যখন বাজারের মাঝ দিয়ে যায়, কত কুকুর পিছনে চীৎকার করতে থাকে, হাতী তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। তেমনি সংসারের লোক মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে চীৎকার করতে থাকলেও মহাপুরুষরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না।*

স্বামীজীও সেইরূপ নির্ভীক ও অবিচলিত ভাবে সনাতন-ধর্মের বাণী প্রচার করে যেতে লাগলেন।

নানা স্থান হতে বক্তৃতা বা উপদেশ দেওয়ার আমন্ত্রণ আসতে লাগল। কত আলোচনা-বৈঠক বসল। ফলে বেদান্ত

---

*হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁথে হাজার।
সাধুওঁকো দুর্ভাব নহী যব নিন্দে সংসার॥

ধর্মের বহুল প্রচার হল এবং তাঁর ভক্ত ও শিষ্য-সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল।

নিউইয়র্ক, বাফেো, ডিট্রয়ট প্রভৃতি স্থানে প্রচারকেন্দ্র গড়ে উঠল। স্বামীজী অন্যত্র গেলে তাঁর কাজ চালাতেন স্বামী কৃপানন্দ (ডাক্তার স্তাণ্ডার্সবার্গ), স্বামী অভয়ানন্দ (ম্যাডাম মেরী লুইস্), সিস্টার হরিদাসী (মিস্ ওয়াঁলডো), স্বামী যোগানন্দ (ডাঃ স্ট্রীট) প্রভৃতি।

বিভিন্ন দিক্ হতে দেওয়া স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ' ও 'কর্মযোগ', এবং সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর 'সহস্র দ্বীপোদ্যান' ভবনে যে অমূল্য উপদেশ দেন তাই পরে 'Inspired talks' বা বাংলায় 'দেববাণী' নামে প্রকাশিত হয়।

যা হোক্, ইংলণ্ড হতে বারবার আহ্বান আসতে থাকায় এবং ভারতের কল্যাণের জন্য সেখানেও প্রচারকার্য অতি আবশ্যক ভেবে তিনি ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে ফরাসী রাজধানী প্যারী হয়ে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন। আমেরিকার কর্মকেন্দ্রের ভার রইল স্বামী অভয়ানন্দ প্রভৃতির উপর।

ইংলণ্ডেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

এখানেই মিস্ মার্গারেট নোবল স্বামীজীর সহিত পরিচিতা হন। এই অসাধারণ বিদুষী মহিলা পরে (১৮৯৮) ভারতবর্ষে এসে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেন এবং তাঁর নতুন নাম হয় 'ভগিনী নিবেদিতা'—যে নামে তিনি অতি সুপরিচিতা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র সভ্য জগতে।

ইংলণ্ডে থাকার সময় স্বামীজীকে আবার আমেরিকা যেতে হয়। পরে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে তিনি নিজ জন্মভূমিতে ফিরবার জন্ম প্রস্তুত হন। পাশ্চাত্ত্যের প্রচারের ভার দিয়ে যান স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের উপর।

তিনি স্বদেশে ফেরার জন্য কত ব্যাকুল হয়েছিলেন তা বোঝা যায় এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে বিদায় আলাপে।

বন্ধু বললেন—'চার বছর বিলাসের লীলাভূমি গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে ভ্রমণের পর কেমন লাগবে আপনার মাতৃভূমি!'

আবেগকম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, স্বামীজী—'এখানে আসার পূর্বে ভারতকে ভালবাসতাম। এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট পবিত্রতা-মাখা। ভারত এখন আমার নিকট তীর্থক্ষেত্র।'

১৩ই ডিসেম্বর (১৮৯৬) তাঁকে লণ্ডনে পিকাডেলীর প্রকাণ্ড হলে ইংলণ্ডের বন্ধু ও শিষ্যেরা বিরাট বিদায়সভায় সম্বর্ধিত করেন।

১৬ই ডিসেম্বর তিনি লণ্ডন ত্যাগ করে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ফরাসী ও ইতালী দেশের অনেক জায়গা দেখা হয়।

স্বামীজীর এই পাশ্চাত্ত্য অভিযানের ফল কি হয়েছিল? বিজয়গৌরব! কিসের বিজয়? সাম্রাজ্যের নয়, হৃদয়ের।

মহারাজ অশোক পৃথিবীর বিস্তৃত অংশ জয় করেছিলেন

বৌদ্ধধর্মের প্লাবন দিয়ে। এত শ বছর পরে আবার পাশ্চাত্ত্য দেশ জয় করল ভারতবর্ষ তার সনাতন বেদান্তের বাণী শুনিয়ে। ইতিহাস ভারতের কপালে আর কখনো দিয়েছে কি এমন বিজয়-গৌরব-তিলক ?

॥ আটাশ ॥

১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি।

জাহাজ এল কলম্বো বন্দরে। দূরে দেখা গেল দেশজননীর শ্যামল স্নেহাঞ্চল। বিজয়ী সন্তান ভক্তিনত চিত্তে প্রণতি জানালেন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বেদ-বেদান্ত-প্রসবিনী মাকে।

সিংহলে বিরাট অভ্যর্থনা, অগণিত জনতা, প্রাণাবেগে ভরা সম্বর্ধনা।

কি উত্তর দিলেন বিজয়ী সন্ন্যাসী—'আমি কোন মহারাজ বা ধনকুবের বা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক নই, কপর্দকহীন ভিক্ষুক…'

সিংহল হতে রামনাদের মহারাজার ব্যবস্থামত স্টীমারে এলেন ভারতবর্ষ। পাম্বান। ২৬শে জানুয়ারি। ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত, স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্মৃতিবাহী ২৬শে জানুয়ারি।

চল্লিশ ফুট উঁচু স্মৃতিস্তম্ভ রচনা হল। তাতে কি লেখা ছিল ? সত্যমেব, জয়তে—যে স্থানে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্ত্য জগতে বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিজয়ে বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়া অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ের পর তাঁহার ইংরাজ শিষ্যগণ সহ ভারতের মৃত্তিকায় প্রথম পবিত্র পদপঙ্কজ স্থাপন করেন, সেই পুণ্যস্থান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিস্তম্ভ রামনাদাধিপ রাজা ভাস্কর সেতুপতি কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে নির্মিত হইল।

এগিয়ে চললেন স্বামীজী। চারিদিক হতে সম্বর্ধনার আমন্ত্রণ। যথাসম্ভব তৃপ্ত করলেন ভক্তদের। বৃথা সময় নষ্ট করা চলে না। কত কাজ বাকি।

যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দের এবার কর্ম্মকেন্দ্র 'ভারতবর্ষ'।

কলম্বো হতে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্বামীজী যত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার প্রতিটিকে নতুন ভারতের উদ্বোধন-মন্ত্র বলা যেতে পারে। সেগুলি বৈদান্তিক সাম্যবাদের অমর বাণী।

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক; বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপড়ির মাঝ হতে, বেরুক মুদীর দোকান, ভুজাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, বাজার থেকে। এরা হাজার হাজার বছর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা।

এই গণদেবতার আরাধনার কথা শুনালেন উদাত্তকণ্ঠে—'আগামী পঞ্চাশ বছর তোমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা

তোমার স্বজাতি। ***এইসব মানুষ, এইসব পশু, ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার উপাস্য।'

ভারতের বহু কালের মরা গাঙে এল তুফানের তরঙ্গ, দেশময় এল প্লাবন।

স্বামীজী এবার যাত্রা করলেন কলকাতার পথে। জাহাজ ছাড়ল ১৫ই ফেব্রুয়ারি।

২৮শে ফেব্রুয়ারি। শোভাবাজার রাজবাটীতে কলকাতার পক্ষ হতে বিরাট সম্বর্ধনা।

উত্তরে ডাক দিলেন বাঙ্গলার যুবশক্তিকে—'হে বাঙ্গালী যুবকগণ! তোমরা গ্রহণ কর আমার এই কার্যভার, গ্রহণ কর সেবাধর্মের ব্রত।'

আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যবৃন্দকে তিনি এই 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত করলেন, কতকগুলি আগ্রহশীল ব্রহ্মচারী যুবককে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দিলেন এবং যুগধর্ম প্রচার করতে লাগলেন।

১৮৯৭ সাল। ১লা মে। বাগবাজার বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের নিয়ে একটি সংঘ স্থাপনের সিদ্ধান্ত স্থির করেন। সংঘের নাম হল রামকৃষ্ণ মিশন।

মঠ, সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলতে লাগল বটে, কিন্তু স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে সকলে ভীত হলেন। চিকিৎসকগণের পরামর্শে অনিচ্ছাতেও তাঁকে কয়েকজন শিষ্য ও গুরুভাই-এর সঙ্গে আলমোড়া যেতে হল। এখানে আড়াই

মাস থাকায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এখানে পরে তিনি একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৯৮ সালের জানুয়ারি। স্বামীজীর গৌরবময় উত্তর ভারত পরিভ্রমণ শেষ হয় এবং কলকাতায় ফিরে আসেন।

॥ উনত্রিশ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের জন্য একটি স্থায়ী মঠ তৈরি করার সংকল্প অনেকদিন থেকে স্বামীজীর মনে হচ্ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড়গ্রামে মঠের উপযোগী জায়গা পাওয়া গেল। তাঁর ভক্ত মিস্ মূলরের দেওয়া প্রচুর টাকায় ঐ জায়গা কেনা হল। জায়গাটি সমতল করতে যে টাকা লাগে তা স্বামীজীর লণ্ডনের শিষ্যরা দিলেন। আমেরিকার শিষ্যা মিসেস্ ওলিবুল বর্তমান ঠাকুরঘরটি তৈরির সমস্ত খরচ এবং মঠের খরচপত্র চলবার জন্য লক্ষের উপর টাকা পরিচালকদের হাতে দিয়েছিলেন।

আলমবাজার হতে মঠ উঠে এল বেলুড়ে। তখনও বাড়ি তৈরি শেষ না হওয়ায় ঐ গ্রামেই নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ি অস্থায়িভাবে ভাড়া নেওয়া হল। সেখানেই গুরুভাই ও শিষ্যরা বাস করতে লাগলেন।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত মঠ প্রতিষ্ঠা ও মিশনের গঠনমূলক কাজের শৃঙ্খলাবিধান ও শিষ্য-শিষ্যাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন।

কিন্তু তিনি খুব অস্বুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। চিকিৎসকরা পূর্ণ বিশ্রাম ও জলহাওয়া বদলানর জন্য পীড়াপীড়ি করায় তিনি ৩০শে মার্চ দার্জিলিং যেতে বাধ্য হলেন।

সেখানে স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময় খবর পেলেন যে কলকাতায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিয়েছে এবং শত শত নরনারী প্রত্যহ মৃত্যুর কবলে পতিত হচ্ছে।

ত্বরা মে কলকাতা ফিরে এসে জীবসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই ভীষণ বিপদের দিনে অভয় ও সেবা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কর্মীরা স্বামীজীর নির্দেশমত কাজে নিযুক্ত হলেন।

গুরুভাইরা প্রয়োজনীয় অর্থের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হলেন। 'মঠবাড়ি বিক্রি করে আবার গাছতলায় বাস করবেন',—চিন্তা করছেন স্বামীজী এমন সময় চারদিক থেকে প্রচুর টাকা আসতে লাগল। প্রশস্ত জায়গা ভাড়া নিয়ে অনেক কুটীর তৈরি হল। প্লেগরোগীদের সেখানে সরিয়ে কর্মীরা সেবা করতে লাগলেন।

দেশবাসী মুগ্ধ হল, তারা শিখল কি করে জীবকে নারায়ণ মনে করে সেবা করতে হয়। বিবেকানন্দের বিরুদ্ধবাদী নিন্দুকরা বুঝতে পারল যে তিনি শুধু মুখে বৈদান্তিক নন, কাজেও বেদান্তের 'যত্র জীব, তত্র শিব' মন্ত্রের উপাসক।

পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর জিলায় দুর্ভিক্ষে দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকলেও ঘোর বিপদ এবং প্রাণের আশঙ্কার মধ্যেও ব্যাপক জীবসেবার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেশবাসীর

চোখের সামনে এই প্রথম দেখাল রামকৃষ্ণ মিশন। তার পর আজ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের অতুলনীয় সেবার কাহিনী দেশে বিদেশে কে না জানে?

মধ্যে স্বামীজীকে আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেতে হয়েছিল। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আবার ১৯০০ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যান এবং পথে ইউরোপের কত দেশ দেখেন। ডিসেম্বর মাসে আবার বেলুড়ে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর শিলং যান। কিন্তু সেখানে কোনো উপকার হয় নি।

১৯০১ সালে কলকাতার জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেসের) অধিবেশন হয়। সে সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা বেলুড়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং ভারতবাসীর একতা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আফ্রিকা-ফেরত মহাত্মা গান্ধীও বেলুড়ে এসেছিলেন, কিন্তু স্বামীজী সে সময় বাগবাজারে থাকায় সাক্ষাৎ হয় নি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা মঠ ও আশ্রম গড়ে উঠতে লাগল; এবং মাদ্রাজের ইংরাজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' ছাড়াও বাংলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করা হল। মিশনের উদ্দেশ্য ও কাজের প্রসার বেড়ে চলল ঘরে ও বাহিরে, দেশে ও বিদেশে।

॥ ত্রিশ ॥

স্বামীজীর স্বাস্থ্য কিন্তু আর ভাল থাকে না। ক্রমশঃই সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। শ্রীশ্রীগুরুর নির্দেশিত কাজ বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। কবে তাঁর কাছ থেকে ডাক আসবে কে জানে!

১৯০২ সাল জানুয়ারি মাস। জাপানী বন্ধু ডাঃ অকাকুরার আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় গেলেন। সেখান হতে কাশী গিয়েছিলেন। স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে এই শেষ ভ্রমণ।

পরমহংসদেবের জন্মতিথি নিকটবর্তী হওয়ায় স্বামীজী কাশী হতে ফিরলেন।

উৎসব চলছে। মঠের বিশাল প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ। কিন্তু অসুস্থতার জন্য স্বামীজী যোগ দিতে না পারায় সকলেই বিষণ্ণ।

স্বামীজী একান্তে শুয়ে আছেন, পাশে শিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র তাঁর রোগের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণা দেখে ব্যাকুল। শরতের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন—'শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতর ভাবগুলির কিছু কিছুও যদি ঢুকাতে পেরে থাকি, তাহ'লেই দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে জানব।'

শরীর আর ভাল হল না। ক্রমেই রোগ বেড়ে চলল। দুর্বল, যাতায়াতেও যেন কষ্ট হয়! অনবরত ওষুধ খাওয়া আর নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলেন স্বামীজী।

জুন গেল, এল জুলাই। ৩রা রাতটা কেটে গেল দুর্ভাবনার মাঝ দিয়ে।

প্রভাত হল, ৪ঠা জুলাই। স্বামীজী বিছানায় উঠে বসলেন। প্রাতঃকৃত্য শেষ করলেন। কিন্তু সকলের সঙ্গে একসঙ্গে ধ্যান করতে গেলেন না।

কিছু পরে ঠাকুর-ঘরে ঢুকলেন। সব দুয়ার-জানালা বন্ধ করা—এরকম কখনও করেন না। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা পরে বেরিয়ে এলেন স্বামীজী। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন; 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে পায়চারি করতে লাগলেন প্রাঙ্গণে।

স্বামী প্রেমানন্দ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শুনলেন—ধ্যানবিভোর যোগী বলে উঠলেন, 'যদি এখন আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহলে সে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করেছে। কিন্তু কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মাবে।'

খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। সকলের সঙ্গে একত্র খেতে বসলেন। অসুখ বেশী হওয়ার পর থেকে একসঙ্গে খাওয়া হত না। খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই ব্রহ্মচারীদের সংস্কৃত ক্লাসে ডাকলেন। তখন একটাও বাজেনি, অন্যদিন প্রায় তিনটায় এই ক্লাস বসত।

খুব হাসিখুশির মধ্যে লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ পড়ান হল। গল্প বলে বলে সূত্রগুলি বুঝিয়ে দিলেন।

বিকেলে বেড়িয়ে এলেন স্বামীজী। সন্ধ্যার পর দোতলায় নিজের ঘরে গেলেন। সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী বরাবর

থাকতেন। তাকে বাইরে বসে জপ করতে বলে নিজে জপমালা নিয়ে পদ্মাসনে বসলেন।

একঘণ্টা পরে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। ব্রহ্মচারীকে ডাকলেন, বললেন, 'একটু বাতাস।'

রাত ৯টা। চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। ঘোর অন্ধকার। হাত দুটি হঠাৎ কেঁপে উঠল; ঘুমন্ত শিশুর মত অস্ফুট কান্না শোনা গেল।

তারপর দুটি দীর্ঘশ্বাস। চোখের তারা হল স্থির, মাথা হেলে পড়ল বালিশ থেকে।

চীৎকার করে উঠল ব্রহ্মচারী—'একি! স্বামীজী, স্বামীজী!' ছুটে এলেন গুরুভাই ও ভক্তবৃন্দ।

সব শেষ। চলে গেছেন স্বামীজী, চলে গেছেন 'তুফানী সন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ ভারতের যুবশক্তির মধ্যে তুফান উঠিয়ে।

স্বামীজীর নশ্বর দেহ চলে গেছে; কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তাঁর বীর্যদৃপ্ত প্রাণস্পর্শী অমর বাণী, রেখে গেছেন দেশ-বিদেশে তাঁর বেদান্তপ্রচার সমিতি, সেবাব্রতী শ্রীরামকৃষ্ণমিশন ও কর্মী সন্ন্যাসীসংঘ, যা আজও নিরত নরনারায়ণের সেবায়, যা সার্থক করেছে ও করবে কবির ভবিষ্যদ্বাণী—

বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটছে জগৎময়।
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়॥

পরিশিষ্ট

শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনের প্রতি সম্ভাষণ

[১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩]

আমেরিকাবাসী বোন ও ভাই সকল!

আপনারা আমাদিগকে যে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন প্রত্যুত্তর দিতে উঠে আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসংঘের পক্ষ হতে আমি আপনাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করছি। সর্ববিধ ধর্মের জননীস্বরূপা সনাতনধর্মের প্রতিনিধিরূপে এবং সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ হতে আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

এই সভামঞ্চে কতিপয় বক্তা প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন যে, এই সকল দূরদেশাগত ব্যক্তিরাও পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ বিভিন্ন দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়ার গৌরবের অধিকারী হবেন। এঁদেরও আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সকল মতের সার্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করে থাকি। আমরা কেবল সার্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নই, আমরা সকল ধর্মই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি পৃথিবীর সর্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির অন্যতম বলে গর্বিত। আমি আপনাদিগকে গর্বের সঙ্গে বলব, যে বৎসর রোমকগণ ইহুদীদের পবিত্র দেবালয় ধ্বংস করে ফেলে, সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইজরাইল বংশীয়দের দক্ষিণ ভারতে আমরাই সাদরে বক্ষে স্থান দিয়েছিলাম। যে ধর্ম জোরোয়াস্তরপন্থী মহান্ পারসীক জাতির অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং অদ্যাবধি লালনপালন করেছে—আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গর্বিত।

যে স্তোত্রটি প্রতিদিন কোটি কোটি নরনারী পাঠ করেন, যা আমি বাল্যকাল হতেই আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত, তার একটি শ্লোক আপনাদের বলছি—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানা-পথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"নদনদী সকল যেমন বিভিন্ন পথ দিয়ে সমুদ্রাভিমুখে বয়ে যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু সরল কুটিল নানা পথগামী মানুষের, হে প্রভো, তুমি একমাত্র গন্তব্যস্থল।"

এই সর্বধর্ম সম্মেলন, যা ইতিপূর্বে আর কখনও আহূত হয় নি, তা একাধারে গীতা-প্রচারিত মহান্ সত্যের পোষকতা করে সমগ্র জগতের সম্মুখে ঘোষণা করছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"—"যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তার নিকট সেই ভাবে প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলে থাকে।'"

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তার ফলস্বরূপ উন্মত্ত ধর্মান্ধতা বহুকাল এই সুন্দর ধরণীর উপর আধিপত্য করেছে। এইগুলি জগতে হিংস্র উপদ্রব করেছে, বারংবার একে নরশোণিতে প্লাবিত করেছে, মানব-সভ্যতা উৎসন্নে দিয়েছে এবং এক-একটা জাতিকে নৈরাশ্যে অভিভূত করেছে। এই ভয়ঙ্কর দানব যদি না থাকত তা হলে মানব-সমাজ বর্তমান অপেক্ষা আরও উন্নত হত। কিন্তু ঐগুলির মৃত্যুকাল আসন্ন এবং আমি সর্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্বনি হল, তা ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্তা জগতে ঘোষণা করায় একই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তরবারি বা লেখনী দ্বারা পরপীড়নের দুর্মতির অবসান হোক।

সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই আসিবে।

*　　*　　*

সকল অসৎকার্যের মূল—দুর্বলতার জন্যই মানুষ যাহা করা উচিত নয় তাহা করিয়া থাকে।

*　　*　　*

কেহ ধার্মিক কি অধার্মিক পরখ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সে ব্যক্তি কত দূর নিঃস্বার্থ। যে অধিক নিঃস্বার্থ সেই অধিক ধার্মিক।

*　　*　　*

কাহারও উপর প্রভুত্ব করিয়া কাহারও কল্যাণ করিতে পার, এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।

*　　*　　*

অপরের নিকট ভাল যাহা পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্রত্ব হারাইও না।

*　　*　　*

তুমি যে কোন জাতি হও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—তবে তাই বলিয়া তুমি অপর জাতীয় কাহাকেও ঘৃণা করিতে পার না।

*　　*　　*

ভাবিও না তোমরা দরিদ্র, ভাবিও না তোমরা বন্ধুহীন, কে কোথায় দেখিয়াছে—টাকায় মানুষ করিয়াছে? মানুষ চিরকাল টাকা করিয়া থাকে। জগতের যা কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে।

*　　*　　*

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না, প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের সকল কার্য—আহার, বিহার, অধ্যয়ন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা করি—সকলগুলিই যেন আমাদিগকে আত্মত্যাগের অভিমুখ করিয়া দেয়। তোমরা আহারের দ্বারা শরীর পুষ্ট করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পারি?

* * *

যে পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু অধর্ম।

* * *

আমাদের আবশ্যক—লৌহ ও বজ্রদৃঢ় পেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিতেছি। এখন আর কাঁদিবার প্রয়োজন নাই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহাতে আমাদের মানুষ করিতে পারে।

* * *

যাহারা ভোগসুখ ও বিলাসের দিকে ধাবমান, তাহারা আপাতত যতই তেজস্বী ও বীর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিণামে তাহারা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

* * *

কোন ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ? তুমি কি আত্মদর্শন করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে তোমার তাঁহার নামপ্রচারে কি অধিকার? তুমি নিজেই অন্ধকারে ঘুরিতেছ,—আবার আমাকেও সেই অন্ধকারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছ? অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় আমরা উভয়েই যে খানায় পড়িয়া যাইব। অতএব অপরের সহিত বিবাদ করিবার পূর্বে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া অগ্রসর হইও।"

অপর কাহাকেও অনুকরণ করিতে যাইও না। অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভ কখনও সিংহ হয় না। অনুকরণ কখনও উন্নতির কারণ হয় না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন।

* * *

হে বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা ধনী ও বড়লোকের মুখ চাহিয়া থাকিও না, দরিদ্ররাই জগতে চিরকাল মহান্ বিরাট কার্যসমূহ সাধন করিয়াছে! হে দরিদ্র বঙ্গবাসিগণ, উঠ, তোমরা সব করিতে পার আর তোমাদিগকে সব করিতেই হইবে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।

* * *

তোমাদিগকে গভীর ধ্যান-ধারণার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, আবার পরমুহূর্তে যাইয়া এই মাঠের জমিতে চাষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদিগকে শাস্ত্রীয় কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, আবার পরমুহূর্তেই এই জমিতে যে ফসল হইবে তাহা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাদিগকে খুব সামান্য কাজ—যেমন পাইখানা সাফ—পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—শুধু এখানে নহে, অন্যত্রও।

* * *

ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

আমরা হিন্দুও নই, বৈদান্তিকও নই, আমরা ছুঁৎমার্গীয় দল। রান্নাঘর হল আমাদের মন্দির, ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর 'ছুঁয়োনা' 'ছুঁয়োনা' মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর করতে হবে।

* * *

তোমাদের পরের জন্য প্রাণ দিতে হবে, বিধবা পুত্রহীনার চোখের জল মুছাতে হবে, নিরক্ষর গরীবেরা যাতে দু'পয়সা রোজগার করে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান করতে পারে তার উপায় দেখতে হবে, কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারও উপর অত্যাচার করে তা হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে, সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে হবে।—এই তো সন্ন্যাসীর কাজ।

* • *

ওরে, সৎকাজে কোনদিন টাকার অভাব হয় না। যদি তোরা নিঃস্বার্থভাবে দেশের সেবায় লেগে যাস, তাহলে দেশের লোক আনন্দের সঙ্গে তোদের টাকা দেবে।

• * * •

আগামী পঞ্চাশ বৎসর, একমাত্র জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেবতা, অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয় বর্ষ ভুললেও কোন ক্ষতি নেই। তোমরা কেন নিষ্কর্মা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছ ? তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখছ, সেই বিরাটের উপাসনা করতে পারছ না ? এইসব মানুষ, এইসব পশু, এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য।

* * *

তুমি যাহা চিন্তা করিবে তুমি তাহাই হইবে। যদি তুমি আপনাকে দুর্বল ভাব তবে তুমি দুর্বল হইবে; তেজস্বী ভাবিলে তেজস্বী হইবে। যদি তুমি আপনাকে অপবিত্র ভাব তবে তুমি অপবিত্র। আপনাকে বিশুদ্ধ ভাবিলে বিশুদ্ধই হইবে।

যদি ভাল চাস ত ঘণ্টা-ফণ্টা গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুর-ঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন। এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। তোরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার কর।

*　　　*　　　*

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

*　　　*　　　*

লেগে যা, ক'দিনের জন্য জীবন ? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা। তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সেই শক্তি জাগিয়ে তোল্। যেখানে মহামারি হয়েছে, যেখানে দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরে যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মরছে, তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে ! একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। লেগে যা, লেগে যা—দেরী করিস নে, মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে, আর পরে করবি বলে বসে থাকিস্ নি, তাহলে কিছু হবে না !

*　　　*　　　*

এদেশে গরীব-দুঃখীদের দিকে কারো নজর নেই। তারাই তো দেশের সমাজের মেরুদণ্ড। অথচ তাদেরই আমরা রেখেছি অচ্ছুৎ করে। এক এক সময় ইচ্ছে হয়, সমাজ থেকে এই ছুঁৎমার্গের সব বাঁধন ছিঁড়ে কুটকুটি করে দিই আর মুচি, মেথর, চাঁড়াল, বামুন, কায়স্থ সকলকে আলিঙ্গন করে বলি, আয় তোরা দূরে দূরে থাকিস্ নি, আজ আমরা সবাই ভাই। এরা না জাগলে দেশ যে স্বত্যিভাবে জাগবে না।

স্বামীজীর জীবন-পঞ্জী

১৮৬৩—১২ জানুয়ারি সকাল ৬।৩৩ মিঃ জন্ম—কলিকাতা

১৮৭৯—প্রবেশিকা পরীক্ষা

১৮৮১—নভেম্বর—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম দেখা

১৮৮৪—পিতার মৃত্যু

১৮৮৬—১৬ আগস্ট—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ

১৮৮৮-৯৩—ভারত পরিভ্রমণ

১৮৯৩—৩১ মে আমেরিকা যাত্রা

১৮৯৩—১১ সেপ্টেম্বর—ধর্ম্মমহাসভার প্রারম্ভিক অধিবেশন

১৮৯৩—২৭ সেপ্টেম্বর—মহাসভার অধিবেশন শেষ

১৮৯৫—ইংলণ্ড যাত্রা প্রথমবার

১৮৯৬—ইংলণ্ডে দ্বিতীয়বার

১৮৯৭—জানুয়ারি—সিংহল—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮৯৭—সেপ্টেম্বর—কাশ্মীর—অমরনাথ

১৮৯৭—রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

১৮৯৮—ডিসেম্বর—বেলুড়মঠের প্রতিষ্ঠা

১৮৯৯—উদ্বোধন প্রকাশ (১ মাঘ ১৩০৫)

১৮৯৯—২০ জুন—ইংলণ্ড যাত্রা

১৮৯৯—৩১ জুলাই—লণ্ডন তৃতীয়বার

১৮৯৯—১৫ অক্টোবর—নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা

১৮৯৯—১০ নভেম্বর—মার্কিন জনসাধারণের অভিনন্দন

১৯০০—অক্টোবর—প্যারিস মহামেলা—ইউরোপ ভ্রমণ

১৯০০—৯ ডিসেম্বর—ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৯০১—১৮ মার্চ—পূর্ববঙ্গে গমন

১৯০১—বেলুড়মঠে দুর্গোৎসব

১৯০১—ডিসেম্বর—কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন ও নেতাদের স্বামীজীর সহিত দেখা

১৯০২—জানুয়ারি—বুদ্ধগয়া—কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা

১৯০২—৪ জুলাই—রাত্রে দেহত্যাগ—বেলুড়